MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র

রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২২তম বর্ষ, নবম সংখ্যা

মে ২০২৬

দাম : দশ টাকা

মে দিবস : শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা : পৃষ্ঠা ৩

লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগল জে. ভি. স্ট্যালিন : পৃষ্ঠা ৫

'ভূমিকম্প : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত : পৃষ্ঠা ৯

ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের নিবন্ধন ও লাইসেন্স দাবি : শেষ পৃষ্ঠা

জন-জাতীয়স্বার্থ বিরোধীরাই জাতীয় সংসদে বসে আছে

আওয়ামী স্বৈরশাসনের উচ্ছেদ হয়েছিল ৫ আগস্ট ২০২৪। ৮ আগস্ট থেকে ১৮ মাস অন্তর্বর্তী সরকার দুঃশাসন চালিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। বিদায় বেলায় জাতীয় নির্বাচনের ৩ দিন আগে জাতীয়স্বার্থ বিরোধী এক অসম বাণিজ্য চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে করে গেছে। এটাকে চুক্তি বলার চেয়েও চুক্তির নামে বৃহৎ শক্তি—ছোট শক্তির ঘাড়ে ধরে সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থাপত্র বলা চলে। চুক্তির অন্যতম কারিগর অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে বর্তমান সরকারের কাঁধে চেপে আছে। নির্বাচনে জিতে বিএনপি সরকার তা হজম করছে। কথিত বিরোধী পক্ষও নীরব সম্মতিতে মেনে নিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিবিসি'র কাছে সাক্ষাৎকারে বলেছেন—বিএনপি, জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতিতেই চুক্তি হয়েছে।

দেড় মাস ধরে সংসদের প্রথম অধিবেশন চললেও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ছাড়া কাউকেই এ বিষয়ে কথা বলার জন্য পাওয়া গেল না। অথচ এরাই সংসদে মাতামাতি, জনজীবন থেকে বহু দূরের বিষয় নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষে তামাশা করে চলেছে। এরা নানা ছলে পুঁজিবাদের সেবক, সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু। এদের কথার ফুলঝুড়ি আর একপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদ থেকে অন্য পক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদের দিকে হেলে পড়াকে দেশপ্রেমের পরাকষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে। মার্কিন অনুমতি সাপেক্ষে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কেনাকাটা ইত্যাদি করতে হবে। বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ৪৫ হাজার কোটি টাকার বোয়িং বিমান কিনার চুক্তি ইতিমধ্যে গত ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে প্রতিটনে ৯ হাজার টাকা বেশি দিয়ে বছরে ৭ লাখ টন কিনতে হবে। ইতিমধ্যে ৫৭ হাজার টন দেশে এসেছে। অথচ বন্ধ কারখানা খোলা ও নতুন কারখানা নির্মাণ করে কর্মসংস্থানের কথা নেই। শিক্ষা-চিকিৎসার বেহাল দশা কাটাতে টাকা নেই। এ যেন গোদের উপর বিষফোড়া।

বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ সোচ্চার রয়েছে, একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছে। সংসদে স্পিকারের সাথে দেখা করে স্মারকলিপি দিয়েছে। একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ব্যরিষ্টার রুমিন ফারহানা বাণিজ্য চুক্তিটি সংসদে উত্থাপনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার উত্থাপিত বক্তব্যকে বিধি অনুযায়ী নয় বলে টেকনিক্যাল অজুহাতে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ ক্ষমতার হাত বদল যত দেখে এবং ক্ষমতা বদলে ভূমিকা রাখে তার খুব কাছাকাছিও তাদের ভাগ্যের বদল হয় না। যাদের বদল হয় তারা জনতাকে ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার সামগ্রীতে জমা রাখে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ভোটের আগে বেহেশতের টিকেট বিক্রি করেছে এখন কপালের লিখন দেখিয়ে কাজ সারছে। ঘরের বাইরে বিশ্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলি অভিযানে অসহনীয় বিশ্ববাজার আর ঘরের ভেতরে অশান্তির আগুন ও অশনি সংকেত চলছে।

সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর আড়াই মাসের মধ্যে দেশে ৪৬৪ হত্যা মামলা, ৬৬৬ ধর্ষণ মামলা হয়েছে। মব সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতন ২০২১ সালে ছিল ৩ হাজার ৩৪৮টি, ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ৬২৬টিতে। ৫ মার্চ থেকে ৭ মার্চ ২ দিনে পত্রিকার খবরে নওগাঁ জেলায় স্ত্রী-কন্যাকে হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা। বগুড়ায় নাতির লাঠির আঘাতে নিহত বৃদ্ধ দাদা, কিশোরগঞ্জে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ১ জনের মৃত্যু, নেত্রকোণায় নিজ গৃহে ঝুলন্ত ৯ বছরের মৃত কন্যাশিশু, জামালপুরে নিজ বাসার ভিতরে গৃহবধু তানিয়া (৩২) হত্যার পর আইনজীবী স্বামী লাশ পোড়ানোর চেষ্টা করে। (কালেরকণ্ঠ, ৭ মার্চ ২০২৬)।

হাম এর টিকা ও চিকিৎসার অভাবে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ২৬৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭ মাসে ২ হাজার ২৫৫ শিশুর মৃত্যু হাম-নিউমোনিয়া জ্বর, অপুষ্টি ইত্যাদিতে। ইউনূস আমলে ৩ হাজার শিক্ষক মব এর শিকার হয়েছিল। ৬ শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেছেন। ৪ জন স্ট্রোক আক্রান্ত হয়েছেন। এসবের প্রতিকারে কোনো উদ্যোগ নেই। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর এ চেহারা দেখার কথা ছিল না। এটা পালাক্রমে চলে আসা নানা পোশাকধারী বুর্জোয়া অপশাসনের ফল। এটা সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে পাকিস্তানি উপনিবেশিকতা বিরোধী ও শোষণমুক্তির লড়াইয়ে অর্জিত গণচেতনার মানকে স্বাধীনতাত্তোরকালে ক্রমাগত নিচে নামানোর মধ্য দিয়ে। মুক্তির জনযুদ্ধকে নেতৃত্বের সুবাদে দলীয় ও পারিবারিক যুদ্ধের সাইনবোর্ড সর্বস্ব করা, জনক-ঘোষক, বাঙালি-বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিতর্কের আড়ালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনর্বাসন, খোলামেলা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তি মালিকদের কাছে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

স্পিকারকে স্মারকলিপি ও সংসদ সদস্যদের প্রতি খোলাচিঠি প্রদান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল কর

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তিসহ জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ ও সংসদে উত্থাপন করে বাতিলের দাবিতে এবং ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা, ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যা ও সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-যুদ্ধ বন্ধের জন্য সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের দাবিতে ২৭ এপ্রিল '২৬ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট সংসদ অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল ও স্পিকারের কাছে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি পালন করে।

বিক্ষোভ মিছিলের পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত এই অসম বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীন বাণিজ্যনীতি-কর, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্রয়নীতিকে মার্কিন কর্পোরেট স্বার্থের কাছে বিকিয়ে দেওয়ার শামিল। এ ধরনের চুক্তির ফলে দেশীয় শিল্প ও কৃষিখাত ধ্বংস হবে, শ্রমিকের মজুরি ও অধিকার সংকুচিত হবে, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে এবং রাষ্ট্রের বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তে বিদেশি কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প, তৈরি পোশাক

শিল্পসহ রপ্তানিমুখী খাতগুলো মার্কিন বাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীরা বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তাঁরা সংসদের সকল দল ও সদস্যকে এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং সংসদে আনুষ্ঠানিক নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপনের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এ চুক্তি গোপনে করা হয়েছে—জনগণ কিংবা সংসদকে অবহিত না করেই—যা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সরাসরি লঙ্ঘন। এছাড়াও এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। রাশিয়া-চীনসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে মার্কিন মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে, মার্কিনীদের কাছ থেকে চড়া মূল্যে সামরিক সরঞ্জামাদি কিনতে হবে। এরই মধ্যে ১৪টি বোয়িং বিমান কেনার কথা বলা হচ্ছে যা বাড়তি মূল্যে যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত।

জোটের নেতা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-(বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফি রতন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-র সমন্বয়ক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করতে : স্পিকারকে স্মারকলিপি প্রদান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাসুদ রানা, বাসদ (মাহবুব)-এর সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশীদ ভূঁইয়া, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসিরউদ্দীন আহমেদ নাসু, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ।

পরে প্রেসক্লাব থেকে যাত্রা শুরু করে মিছিলটি শাহবাগ, কাওরানবাজার ও ফার্মগেট হয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সমবেত হয়। সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ১২নং গেটের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য রাগিব আহসান মুন্না, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, সাম্যবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা বেলাল চৌধুরী, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ডা. হারুন-অর রশীদ এবং বাসদ-(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় নেতা সীমা দত্ত।

এরপর বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাসদ-(মার্কসবাদী)র সমন্বয়ক মাসুদ রানা এবং বাসদ (মাহবুব)-এর মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটনসহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মাননীয় স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় চিফ হুইপের কাছে সংসদ সদস্যদের প্রতি খোলাচিঠি প্রদান করা হয়।

সংসদ ভবন থেকে বের হয়ে নেতৃবৃন্দ জানান, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন চলবে। এই সময়ের মধ্যেই চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা করে তা বাতিল করতে হবে, এবং ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা ও গাজায় গণহত্যা বন্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আগামী ১১ মে সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। ৪ ও ৫ মে বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রতিনিধিসভা অনুষ্ঠিত হবে। আর ৯ মে-এর মধ্যে চুক্তি বাতিল না হলে আরও বৃহত্তর ও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দেন।

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারকে প্রদত্ত স্মারকলিপি

বরাবর,
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম
মাননীয় স্পিকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
বিষয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী বাণিজ্যচুক্তিসহ সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতীয় সংসদে উত্থাপন, সকল অসম চুক্তি বাতিল এবং ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলাসহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের দাবিতে স্মারকলিপি।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

দেশের ১৩টি বাম-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট'-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'রেসিপ্রোকাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট-আরটিএ' নামে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে ননডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা গোপনীয়তা-চুক্তির ভিত্তিতে।

আমরা মনে করি, দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের সাথে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের এখতিয়ার অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেই। তাই, এ চুক্তিসংক্রান্ত আলোচনা চলাকালে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দাবি জানিয়েছিলাম—নির্বাচিত সরকার আসার আগে তাড়াহুড়ো করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন এ চুক্তি স্বাক্ষর না করে। কিন্তু, অধ্যাপক ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের উদ্বেগ-আপত্তি গ্রাহ্য করেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজ এবং মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের ওয়েবসাইটে চুক্তিটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমেও চুক্তির খুঁটিনাটি প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্টজনেরা চুক্তির নানাদিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাতে দেখা যায়, এ চুক্তিটি অসম-অন্যায্য ও বাংলাদেশের জন্য অধীনতামূলক। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশ শুধু অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও ক্ষুণ্ন হবে।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এলএনজি আমদানি করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, বেশি দামে গম, সয়াবিন-তুলা, মাছ-মাংস, ফলমূলসহ বিভিন্নপণ্য কিনতে হবে। এর ফলে আমাদের কৃষি ও শিল্পখাত মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাবেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিনা-দরপত্রে মার্কিন কোম্পানি বোয়িং-এর কাছ থেকে উড়োজাহাজ কিনতে হবে। কিনতে হবে সামরিক সরঞ্জামও। বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্ক-সুবিধা পাবে। এর ফলে বাংলাদেশ বছরে ১ হাজার ৩২৭ কোটি টাকার রাজস্ব হারাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ সুবিধা পাবে মাত্র ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে। এর মধ্যে অধিকাংশ পণ্য রপ্তানির সুযোগ ও সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরকম কোনো দেশের সাথে অর্থাৎ চীন, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সাথে বাংলাদেশ কোনো বাণিজ্যচুক্তি করতে পারবে না। এ শর্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল।

মাননীয় স্পিকার,

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গণআন্দোলনের পর দেশে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম চলছে। সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত সব চুক্তি সংসদে উত্থাপন করা আবশ্যক। আমরা চাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তিসহ অতীতের সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উত্থাপন করা হোক এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল করা হোক।

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর বর্ধিত হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করেছিলেন। তারপর চাপ প্রয়োগ করে অসম চুক্তি সম্পাদনে বিভিন্ন দেশকে বাধ্য করেছিলেন। সে চাপের মুখে বাংলাদেশের নতজানু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের একতরফা শুল্কনীতি অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মালয়েশিয়া ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করেছে। ভারত স্থগিত করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও চুক্তি স্বাক্ষর থেকে বিরত রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার,

বর্তমান সংকটময় বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কেও আপনি অবগত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইসরায়েল ইরানে যৌথ সামরিক হামলা চালিয়ে সে দেশের প্রধান ধর্মীয় নেতা আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে শিশু ও নারীসহ কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিককে। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালসহ অসংখ্য বেসামরিক স্থাপনা ধ্বংস করেছে। জেনেভা সনদ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে জায়নবাদী ইসরায়েল বছরের পর বছর ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাচ্ছে। তেলসহ বিরল খনিজসম্পদ দখল করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দস্যুর মতো হানা দিয়ে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অবরোধ-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিউবাকে পদানত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এক কথায়, সারা বিশ্ব এখন মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মুখে। আমরা চাই, ইরানে হামলা, ফিলিস্তিনে গণহত্যাসহ বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে জাতীয় সংসদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। আমাদের সংবিধানের ২৫ (গ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে 'সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।'

মাননীয় স্পিকার,

আপনি দেশের একজন বরেণ্য রাজনীতিক ও বার বার নির্বাচিত সংসদ সদস্যই শুধু নন, আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশের স্বার্থবিরোধী বৈদেশিক চুক্তি এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নিয়ে আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন।

আমাদের প্রত্যাশা–জাতীয় সংসদে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য, জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল বৈদেশিক চুক্তি বাতিল করার জন্য এবং দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আপনি আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদসহ
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের পক্ষে

বজলুর রশিদ ফিরোজ : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ; সাজ্জাদ জহির চন্দন : সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি; নাজমুল হক প্রধান : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাসদ; ইকবাল কবির জাহিদ : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ; শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী : সমন্বয়ক, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন; মাসুদ রানা : সমন্বয়ক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী); মোশরেফা মিশু : সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি; হারুনার রশিদ ভূঁইয়া : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ মাহবুব); নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু : আহ্বায়ক, গণমুক্তি ইউনিয়ন; আবদুল আলী : নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি; শহিদুল ইসলাম : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টি; রজত হুদা : ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক, জাতীয় গণফ্রন্ট; সৈয়দ হারুন অর রশীদ : সভাপতি, সোনার বাংলা পার্টি।

বিভাগীয় প্রতিনিধিসভা

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্যচুক্তি বাতিল, নিউমুরিং কন্টেইনার ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা বন্ধ, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ৪ ও ৫ মে ২০২৬ বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪ মে :

রংপুর, বরিশাল : কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ বিভাগে প্রতিনিধিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫ মে :

রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধি সভা বগুড়ায়; খুলনা, (বিভাগের প্রতিনিধি সভা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়), চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের প্রতিনিধিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাওরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত কর

১২ পৃষ্ঠার পর

মে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা উজ্জ্বল রায়, বিশ্বজিৎ নন্দী এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রাজীব সূত্র ধর।

সিলেট

২ মে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে বানববন্দন সমাবেশ পালিত হয়। সমাবেশে নেতৃবৃদ বলেন, ধান কাটার আগেই হাওরাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও দেশে ভারী বৃষ্টির পাতের ফলে কৃষকের খেতের বোরো ধান তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুধু মাঠের ফসলই নয়, উঁচু জায়গায় স্তূপ করে রাখা খড়, ঘরে তোলার পর মাড়াই করা ধান বৃষ্টির পানিতে ভেসে গেছে বা পচে গেছে, যা পশুখাদ্যের সংকট তৈরি করবে। তাই দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতির মূল্যায়ন করে তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

মে দিবস : শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেট থেকে যে আন্দোলনের ঢেউ জেগে উঠেছিল—তা আছড়ে পড়েছিল পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশের প্রান্তে প্রান্তে। যেখানেই শ্রম শোষণ সেখানেই বঞ্চনা। এই বঞ্চিত শ্রমজীবীদের বুকের বেদনা আর চোখের স্বপ্ন ধারণ করে গড়ে ওঠে ন্যায্য মজুরির লড়াই। মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির বাসনা আর শ্রমিকের মজুরির দাবি এই দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ম। ফলে লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ে যুক্তি, আবেগ আর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় মে দিবস শ্রমিকদের কাছে এক সংগ্রামী প্রেরণা। ১৮৮৬ সাল থেকে ২০২৬ সাল, ১৪০ বছর। মে দিবসের আহ্বান মানুষকে আলোড়িত করে এখনও। প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যে মানবজাতি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে নিজেকে রক্ষা ও বিকশিত করে চলেছে।

আদিম মানুষ থেকে আধুনিক মানুষের এই অগ্রযাত্রায় যা কিছু মানুষের অর্জন তাঁর সবকিছুর পিছনেই আছে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম, সংগ্রাম ও সাধনা। মানবজাতির সংগ্রাম ও বিকাশের ইতিহাসে যে দিনগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে, যে দিনগুলো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রেরণা জোগায় এবং শোষণ, বৈষম্যহীন ভবিষ্যৎ সমাজের দিশা দেখায়, মে দিবস তাদের মধ্যে অন্যতম। এই দিবসকে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' বলা হয় কারণ আট ঘন্টা কাজের দাবি উত্থাপন করেছে শ্রমিকরা, শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন করেছে, নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছে রক্ত ও জীবন দিয়েছে এবং আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের কাছে। ফলে এই আন্দোলন শুধু দেশের গণ্ডিতে আটকে থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের দেশে দেশে। যদিও দাবি উত্থাপন করেছে শ্রমিকরা, আন্দোলন করেছে রক্ত ও জীবন দিয়েছে শ্রমিকরা

কিন্তু এই দিবসের দাবি শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য নয় বরং মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থকে তুলে ধরেছিল। তাই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন ভাষা, ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গের মানুষকেই মে দিবস সংগ্রামে উদবুদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ করে। পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত শ্রেণি বিভক্ত মানুষের পৃথিবীতে দুনিয়ার মজদুর এক হও! এই স্লোগানের তাৎপর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মে দিবসের চেতনায়।

মে দিবসের জন্য শ্রেণি সংগ্রাম থেকে—শোষিত শ্রমিকশ্রেণির আট ঘণ্টা কর্মদিবস, উন্নত কাজের পরিবেশের জন্য লড়াই শুরু হলেও এই সংগ্রাম ছিল মালিকশ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে।

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব। যুদ্ধ হচ্ছে সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে, ধ্বংস হচ্ছে জনপদ আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে শ্রমিকের মনে। এরকম যুদ্ধ চললে কী হবে তাদের জীবন এবং জীবিকার? যুদ্ধের অজুহাতে মজুরি কমলেও দাম বাড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয় এটা সবাই দেখে কিন্তু মানুষের মৃত্যু ছাড়াও যুদ্ধের দুটো রূপ আছে। একটা প্রকাশ্য, দেখা যায় তার ধ্বংসলীলা, ধ্বংস হচ্ছে ভবন- সেতু, বিশ্ববিদ্যালয়, এসব তৈরি হয়েছিল শ্রমিকের শ্রমে। ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বিমান-কামান, যুদ্ধ জাহাজ, মিসাইল-ড্রোন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি এসবও তৈরি হয়েছে শ্রমিকের শ্রমে। যুদ্ধের পরে যখন আবার গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে তখন সকলে ভাববেন, অর্থের প্রয়োজন হবে প্রচুর। কিন্তু অর্থ আর পরিকল্পনা থাকলেই তো হবে না, প্রয়োজন হবে শ্রমিকের। সেই শ্রমিক দেশি বা প্রবাসী যাই হোন না কেন। ফলে কী ধ্বংসের অস্ত্র তৈরিতে, কী নির্মাণে সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিকের শ্রম অত্যাবশ্যকীয়। আর অপ্রকাশ্য দিক হলো, সকল সৃষ্টির মূলে থাকে শ্রমশক্তি আর যুদ্ধের মূলে থাকে সম্পদ দখল। যেহেতু সম্পদ সৃষ্টির মূল কারিগর শ্রমজীবী মানুষ তাই শ্রমজীবী মানুষকে যত বেশি খাটিয়ে যত কম দেওয়া যায় সেই যুদ্ধ চলছে নিঃশব্দে এবং অবিরাম।

দেশে দেশে যুদ্ধের পাশাপাশি আরও একটি যুদ্ধ চলছে প্রতিনিয়ত। সেটা প্রকৃতির সাথে। মাটির নিচ থেকে তোলা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। জলবায়ু বিপর্যয় এখন শুধু আলোচনার বিষয় নয় এটা এখন আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব সকল ক্ষেত্রে পড়লেও শ্রমিকের জীবনে তা দেখা দিচ্ছে জীবন, জীবিকা, শারীরিক সুস্থতা আর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর ভয়াবহ আঘাত হিসেবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজকে এগিয়ে দিচ্ছে বিপুলভাবে। কিন্তু টেকনোলজি জীবনকে যেমন সহজ ও গতিময় করছে শ্রমিকের কাজকে তেমনি করছে ঝুঁকিপূর্ণ। উন্নত টেকনোলজির সাথে উন্নততর দক্ষতা প্রয়োজন। যে শ্রমিকের দিন এনে দিন খাওয়ার অবস্থা, সে তার এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করবে কীভাবে? ফলে একদিকে সমাজের উন্নতি আর অন্যদিকে শ্রমিকের অনিশ্চয়তা এক পরস্পর বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

অ্যাডাম স্মিথ আর ডেভিড রিকারডো যাদেরকে বলা হয় আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক তাঁরা দেখিয়েছিলেন কীভাবে পণ্যের মূল্য শ্রমের উপর নির্ভরশীল। কীভাবে বাজারের অদৃশ্য হাত পণ্যের দাম এবং শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে। শ্রমিক অর্থনীতি না বুঝলেও এটা বুঝেছে যে, কাজ না করলে জীবন বাঁচবে না আর সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখেছে কীভাবে তাদের শ্রমে সম্পদ গড়ে ওঠে। ফলে তৈরি হতে থাকে অধিকার সচেতনতা। ১৭৬০ সালের শিল্প বিপ্লব আর ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব এক যুগান্তকারি পরিবর্তন নিয়ে আসে পৃথিবীর ইতিহাসে। যন্ত্রশিল্প শুধু কারখানা তৈরি আর উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায়নি, বাষ্প শক্তি ব্যবহারের ফলে রেলপথ, জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। একদিকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নারীর মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান

৮ মার্চ ১১৬তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করা, নারী-শিশু ধর্ষণ-নির্যাতনের সকল ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার-বিচার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শিপ্রা মণ্ডল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, ঢাকা নগর শাখার সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক সুস্মিতা মরিয়ম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ আমেরিকায় নিউইয়র্কের সুতা কারখানার নারী শ্রমিকদের কাজ করতে হতো—'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত—এক দীর্ঘ কর্মঘন্টা। কাজ করতে হতো অমানবিক-অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, ছিল মজুরি বৈষম্য, অভিবাসী ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন। এসকল দাবির প্রতিবাদে এবং ভোটাধিকারের দাবিতে নারীরা বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসেন। হাজার হাজার নারীর এই মিছিলে পুলিশ নৃশংস হামলা চালায়। পরবর্তীতে নারী অধিকার আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ৮ মার্চকে নারী দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করেন। ইউরোপের দেশে দেশে নারীদের এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংগ্রামী প্রেরণার উৎস।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ এর আগস্টে দেশে এক অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল। বিগত দিনের সকল লড়াইয়ের মতোই এ ক্ষেত্রেও নারীদের অগ্রণী ভূমিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও আমরা লড়াই শেষে নারীদের গৃহবন্দি করার ষড়যন্ত্রও দেখেছি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। নির্বাচিত সরকারের সময়কালে ইতিমধ্যেই নরসিংদীর মাধবদী, ঢাকার হাজারিবাগ, পাবনার ঈশ্বরদী, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে লোমহর্ষক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। শুধু গ্রেপ্তার করেই এর সমাধান সম্ভব নয়। এ নির্যাতন বন্ধে সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং ন্যায্য বিচার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। প্রয়োজন মাদকের অবাধ প্রসার ও ওয়াজ মাহফিলের নামে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা বন্ধ করা। প্রয়োজন পর্ণোগ্রাফি রোধ করে পাঠ্যপুস্তকে সংগ্রামী ও মহীয়সী নারীদের জীবনী যুক্ত করা।'

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান একথা বলা হলেও বাংলাদেশে নারীরা এখনো আইনি বৈষম্যের শিকার। পিতামাতার সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুরক্ষা নিয়ে এখনও লড়তে হচ্ছে। 'সমকাজে সমমজুরি' আইনে থাকলেও এখনও সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় নাই। সরকার আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুমোদন করলেও বাস্তবায়নের জন্য কোন আইন বা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নারীর শ্রম এবং সম্ভ্রম যেমন পুঁজিবাদী শোষণের শিকার তেমনি সমাজে নারী-শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ, হত্যা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। এসব মোকাবিলা করে নারীরা যখন ওঠে দাঁড়ানোর সংগ্রাম করছে তখন ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আক্রমণ নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। তাই আজকে নারী-পুরুষসহ সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদেরকে এই শোষণ, বঞ্চনা ও অবমাননা রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথেই যুক্ত হয়ে আছে প্রকৃত অর্থে নারীমুক্তি অর্জন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চেতনার মূলেও ছিল শোষণ-বৈষম্যহীন সাম্য সমাজ গড়ার আহ্বান।

ইরানে সাম্রাজ্যবাদী হামলা : আমাদের নৈতিক দায় ও প্রতিরোধ

ইরানের ওপর এক ভয়ংকর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ট্রাম্পের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী ইসরায়েল। ইরানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার হুংকার দিয়ে সামরিক-বেসামরিক স্থাপনা, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাথমিক স্কুল, বাজার-মাজার, মসজিদ সর্বত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি কোন বিচারেই ইরান আমেরিকার সমকক্ষ নয়। প্রায় দুই মাস ধরে ইরানের ওপর হামলা এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বনাম ইরান যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে সারা বিশ্ব। এই যুদ্ধের কারণ কী তা নিয়ে আলোচনা যেমন চলছে আমাদের দেশসহ বিশ্বব্যাপী তেমনি যুদ্ধের আঁচ লেগেছে রান্না ঘরের চুলা পর্যন্ত। জ্বালানিনির্ভর বিশ্বে জ্বালানিসমৃদ্ধ এলাকাগুলো আক্রান্ত হলে কেউ রেহাই পাবে না তার প্রভাব থেকে এটা যেমন সত্য তেমনি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সম্পদ দখল এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কত নৃশংস হতে পারে, যুদ্ধের আগুনে সবকিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং নিজেদেরমতো করে দুনিয়াকে ভাগবন্টন করতে গিয়ে মানবিকতা, গণতন্ত্র সবকিছুকে ধুলিসাৎ করতে পারে তার নিদর্শন দেখা গেছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর বিশ্ব মানচিত্রের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধ শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ থাকলে বাজার দখলের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ থাকবেই, লেনিনের এই বিশ্লেষণ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে; পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ দখল এবং সামরিক, বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর ওপর।

সাম্প্রতিক সময়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে স্ত্রীসহ তাদের শোবার ঘর থেকে ধরে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে বিচারের সম্মুখিন করা, আর ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করা—এই দুই ঘটনা দুই দেশে এবং দুই অঞ্চলে ঘটলেও একটা প্রশ্ন তৈরি হয়, কেন যুক্তরাষ্ট্রের এই আক্রমণ? তাহলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যেখানে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রগুলো আর তার নেতাদেরকে বিপজ্জনক মনে করছে? ভেনেজুয়েলা দুর্বল কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। জ্বালানি ক্ষুধার্ত বিশ্বে সর্ব বৃহৎ জ্বালানি তেলের মজুদ যে দেশে তার ওপর নজর পড়বেই, সঙ্গে আছে বিশাল সোনার ভাণ্ডার, নানা রকম খনিজ পদার্থের বিপুল সম্ভাবনা ফলে লোভে চোখ যেমন চকচক করেছে তেমনি আক্রমণের অজুহাত তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাসের রিজার্ভ, পৃথিবীর তেল মজুদের তিন শতাংশ আর তেলবাহি ট্যাংকার যাতায়াতের অন্যতম প্রধান রুট হরমুজ প্রণালী যার নিয়ন্ত্রণে সেই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য আমেরিকা গোপন করেনি। সাথে নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে তার স্বার্থ রক্ষার প্রধান সহচর ইসরায়েলকে। আর আক্রমণ চালিয়ে ইরানকে বুঝাতে চাইছে যে, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করেই তাকে চলতে হবে। ইরান তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। চলছে এক অসম যুদ্ধ। মার্কিন মদদে জায়নবাদী ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজায় চালাচ্ছে নির্মম গণহত্যা।

সারা দুনিয়াতে গণতন্ত্রের চর্চার প্রধান প্রশিক্ষক দাবিদার মার্কিন যে গণতন্ত্রের ধার ধারে না তা নির্লজ্জের মতো প্রমাণ করেছে বহুবার। বামপন্থিরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, পুঁজিবাদ কখনোই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে না। তার কাছে মানুষের চাইতে মুনাফা বড়। মার্কস দেখিয়েছেন মুনাফার জন্য পুঁজিবাদ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ফলে গণতন্ত্র-স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোন কিছুই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বহুল কথিত সার্বভৌমত্বের সীমারেখা, প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিক সিদ্ধান্ত নেবে তাদের দেশ কেমন করে চলবে। নেতাদের অপরাধ থাকলে রাষ্ট্রের ভেতরেই নেতার বিচার হবে, কেউ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না সেসব কথা এখন মূল্যহীন। কোন দেশের সার্বভৌমত্ব এখন নিক্ষিপ্ত হয়েছে সমুদ্রে।

বাংলাদেশে তো বটেই সারা দুনিয়ার মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখন ইরান। ইরান কীভাবে মোকাবিলা করছে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধ? কোথায় বোমা পড়ছে এবং কোথায় ড্রোন হামলা করছে তা নিয়ে পত্রিকার পাতা এবং চায়ের দোকান সরগরম। মানুষ যুদ্ধ অপছন্দ করে কিন্তু যুদ্ধের খবরে ভীষণ আগ্রহ। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং সত্যিকারের ফলাফল কী তা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান না করলেও যুদ্ধে কে জিতছে, কে হারছে সেটাই তাদের প্রধান বিষয়। যে কোন যুদ্ধের প্রধান আঘাত কাদের ওপর পড়ে; শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ এর ভুক্তভোগী হন কীভাবে; নারীদের উপর যুদ্ধের ফলাফল কী, শিশুরা কী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠছে, বৃদ্ধরা তাদের জীবনকে কীভাবে সমাপ্ত করবেন আর যুবকদের ভবিষ্যৎ কী? উত্তেজনার সময়ে এসব ভাবনাতেই আসে না। যুদ্ধে নজর থাকে সৈন্য এবং অস্ত্রের দিকে কিন্তু যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর মানুষ কী খাবে, কীভাবে বেঁচে থাকবে সেই আলোচনা থাকে আড়ালে। অথচ যুদ্ধ থামলেও মানুষের এই প্রয়োজন তো কখনই থামবে না।

একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত তীব্র হয়েছে, জ্বালানি বাজার অস্থির, অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ টানা কয়েক বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে অস্থির করে রেখেছে। এই সংঘাতগুলোকে আঞ্চলিক সামরিক দ্বন্দ্ব হিসেবে ভাবার কোন কারণ নেই। এর প্রভাব বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা আর জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে ৩ হাজার ৭০০ কি.মি এবং সমুদ্রপথে ৬ হাজার কি.মি. দূরত্বে ইরান কিংবা আকাশ পথে ৬ হাজার কি.মি. দূরে ইউক্রেন। কিন্তু দুই কিলোমিটার দূরের কাঁচাবাজারেও এই যুদ্ধের প্রভাব পড়ে। দূরের যুদ্ধে সবচেয়ে আগে যা অস্থির হয়ে ওঠে, সেটা হলো জ্বালানি তেলের বাজার। তেলের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। আর বাংলাদেশের জ্বালানি তেল পুরোটাই আমদানি নির্ভর। ইতিমধ্যেই দেশে ডিজেল-পেট্রল, অকটেনের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের খাবারের পাতে, যানবাহনের ভাড়ায় আর সংসারে।

খাদ্য আসবে কৃষি থেকে আর কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হলো পানি এবং সার। হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের পাশাপাশি সারের সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থা আরও কয়েক দিন চললে আসন্ন মৌসুমে ফসল উৎপাদন ব্যাহত ও পণ্যের দাম অবশ্যম্ভাবীভাবেই বাড়বে। এ আশঙ্কা শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বেই। কারণ বিশ্বে সার তৈরির প্রায় এক-চতুর্থাংশ কাঁচামাল হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হয়। কিন্তু যুদ্ধের কারণে গত কয়েক দিন ধরে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের প্রধান উপাদান অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন পরিবহন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ধারণা করা হয়, বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই নির্ভর করে কৃত্রিম নাইট্রোজেন সারের ওপর। সার সরবরাহ কমলে ফসল উৎপাদন কমবে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও খাদ্যপণ্যের দাম বাড়বে। শুধু মানুষের খাদ্য নয় পশুখাদ্যের খরচও বেড়ে যাবে।

রাশিয়া, মিসর ও সৌদি আরবের পর ইরান বিশ্বে ইউরিয়া রপ্তানিতে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। ইউরিয়া হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নাইট্রোজেনভিত্তিক সার। নাইট্রোজেন জাতীয় সার তৈরির মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ ব্যয় হয় জীবাশ্ম গ্যাসের পেছনে। উপসাগরীয় অঞ্চলে জীবাশ্ম গ্যাসভিত্তিক কয়েকটি প্লান্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক নাইট্রোজেন সরবরাহ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে।

যার ফলে বিশ্ববাজারে সারের দাম ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় হামলা চালানোর পরও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে মিসরের ইউরিয়ার দামকে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ধরা হয়। সেটি বর্তমানে ২৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। পণ্যবাজার বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি টন ইউরিয়ার দাম বর্তমানে ৬২৫ ডলার। গত সপ্তাহে যা ছিল ৪৮৪ থেকে ৪৯০ ডলারের মধ্যে। শুধু নাইট্রোজেন নয় বৈশ্বিক সালফার বাণিজ্যের প্রায় ৪৫ শতাংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এটি সার উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। পাশাপাশি বিভিন্ন ধাতু ও শিল্প রাসায়নিকের বড় একটি অংশও এ অঞ্চল থেকে সরবরাহ হয়। ফলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল দুই সপ্তাহের বেশি বন্ধ থাকলে সরবরাহ ও চাহিদার শৃঙ্খল ভারসাম্যহীন হয়ে যেতে পারে।

ফসল বপন মৌসুমের আগে সারের চাহিদা বাড়ে। যদি সময়মতো সার না পায়, বেশি দামের জন্য জমিতে প্রয়োজনের তুলনায় কম সার দেওয়া হয় তাহলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে ফসল উৎপাদনের ওপর। এর ফলে কৃষক শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই নয়, খাদ্য সংকটে পড়বে সারা বিশ্ব। কারণ নাইট্রোজেনের ব্যবহার সামান্য কমলেও ফলনে তার প্রভাব কম হবে না। বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন টন ফসল উৎপাদন কমে যাবে। ফলে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে। যেমন–পশুখাদ্যের বাজার, গবাদি পশু উৎপাদন, বায়োফুয়েল শিল্প এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যপণ্যের দামে। সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে পড়বে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ইউরিয়া কারখানাগুলো চালাতে উপসাগরীয় অঞ্চলের আমদানি করা এলএনজির ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ব্রাজিল সয়াবিন ও ভুট্টা উৎপাদন টিকিয়ে রাখতে নাইট্রোজেন ও ফসফেট আমদানি করে। এমনকি বিশ্বের অন্যতম বড় সার উৎপাদনকারী যুক্তরাষ্ট্রও আঞ্চলিক চাহিদা মেটাতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া আমদানি করে। ফলে প্রভাব পড়বে সারা দুনিয়ার ফসল উৎপাদনে। সার সংকট তেলের মতো তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না। জ্বালানি তেলের দামের প্রভাব সরাসরি বুঝা যায় কিন্তু ফসলের উৎপাদনে প্রভাব দেখা যায় কয়েক মাস পর। ফলে হরমুজ প্রণালি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে তার প্রভাব পারস্য উপসাগরের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে জীবনযাত্রায় এক ব্যাপক আঘাত হানবে।

বাংলাদেশের কথা বিবেচনা করা যাক! ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের প্রধান সার কারখানাগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় চালাতে প্রতিদিন প্রায় ১৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালী হয়ে এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশে গ্যাসের সরবরাহ কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পে গ্যাস সরবরাহ কমিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পাঁচটি সার কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ হওয়া কারখানাগুলো হলো–ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড, যমুনা সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো)। বর্তমানে কেবল শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি উৎপাদন চালু রেখেছে।

১৮ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা বছরে প্রায় ২৬ লাখ মেট্রিক টন। তার মধ্যে সিইউএফএলসহ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাগুলো প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করে। অবশিষ্ট ১৬ লাখ মেট্রিক টন আমদানি করতে হয়। এর পাশাপাশি সেচের জন্য নির্ভরশীল ডিজেলচালিত সেচপাম্প আর চাষের ট্রাক্টরের ওপর। এখন ফসল মাড়াই করার জন্যও যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় সেচ-চাষ, মাড়াই খরচ বেড়ে যাবে। তার ওপর যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়বে। এই বাড়তি খরচ কি কৃষক বহন করতে পারবেন? ফলে উৎপাদন কমবে, দাম বাড়বে।

শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের মানুষে আয় বাড়বে না কিন্তু খরচ বাড়বে অনেকগুণ। ফসলের খেত থেকে খাবার পাতে আসতে অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। তাদের খাবার টেবিলে চাল-ডাল, সবজি আসে কীভাবে? আসে ট্রাক-লঞ্চ, জাহাজ-ট্রেন আর বিমানে করে। এসবই চলে জ্বালানি তেলে। যখন তেলের দাম বেড়ে যায়, তখন পণ্য পরিবহনের খরচও বেড়ে যায়। পাইকারি থেকে খুচরা, সব জায়গায় পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাজারে চাল-ডাল সবকিছুর দাম চড়ে যায়। এর সাথে যুক্ত হয় ব্যবসায়ীদের মুনাফা লিপ্সা। এসবের মিলিত প্রভাবে সাধারণ মানুষের খাদ্যপণ্যের দাম বাড়বে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে।

যুদ্ধ হাজার মাইল দূরে থাকলেও, তার প্রভাব পড়বে পাড়ার বাজারে। সাধারণ মানুষের জন্য খাবার কেনাটাই যেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠতে পারে। চাল-ডাল, তেল-সবজি, ডিম-দিন এনে দিন খায় এমন মানুষের জন্য এই জিনিসগুলোর দাম একটু বেড়ে গেলেই তাদের খাবারের পাতে টান পড়ে। যে রিকশাচালক, গার্মেন্টস কর্মী, কিংবা গৃহ শ্রমিক যদি ১০০ টাকায় ২ কেজি চাল কিনতেন, তাকে সেই একই চালের দাম ১২০ টাকায় কিনতে হলে বাড়তি ২০ টাকা জোগাড় করবেন কীভাবে?

যুদ্ধ বিমানের শব্দ, বোমার আওয়াজ সবাই শুনবে না, কিন্তু যুদ্ধের খেসারত দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। যুদ্ধ কেড়ে নেবে তাদের খাদ্যনিরাপত্তা আর জীবনযাত্রার মান। কৃষিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি এ যেন যুদ্ধ শৃঙ্খলের অংশ। ফলে দূরের যুদ্ধটা শুধু কাগজে থাকবে না। সেটা দৃশ্যমান হবে কৃষকের ঘরে, ফসলের মাঠে, শহরের বস্তিতে, আর সাধারন মানুষের খাবারের পাতে। পুঁজিবাদ শোষণ করবে, বাজার দখলের জন্য যুদ্ধ করবে আর খেসারত দেবে শ্রমজীবী মানুষ। ধর্মের বা কপালের দোহাই দিয়ে এই যুদ্ধের কারণ বুঝা যাবে না। কেন ইরানের পাশে সৌদি আরব, কুয়েত থাকে না আর ইরানের পাশে দাঁড়ায় রাশিয়া, চীন এটা বুঝতে হলে বাংলাদেশের সংসদের দিকেও তাকাতে হবে। ধর্মীয় উন্মাদনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে যারা রাজনীতি করে বা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদে গিয়েছে তাদের মুখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এবং যুদ্ধের বিরোধিতার কোন কথা শোনা যায় না। ইসলামি উম্মাহ এই আবেগের কোন প্রতিফলন নেই তাদের কার্যক্রমে। আর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যারা করেন তারাও ক্ষমতার মসনদ হারানোর ভয়ে নিশ্চুপ। ফলে ইরানসহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বামপন্থিদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলাই এখন নৈতিক দায়িত্ব।

লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগল—জে ভি স্ট্যালিন

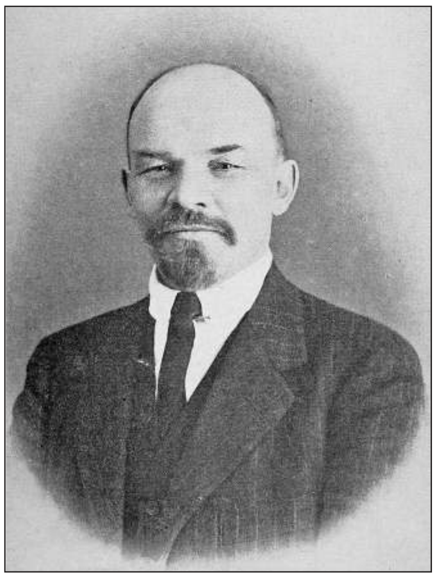

[ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন : জন্ম ২২ এপ্রিল ১৮৭০; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪। ২২ এপ্রিল ২০২৬ ছিল লেনিনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি ক্রেমলিন মিলিটারি স্কুলে লেনিনের স্মরণে দেওয়া কমরেড স্ট্যালিনের একটি অসামান্য ভাষণ, যা পাঠককে লেনিনের জীবন সংগ্রাম বুঝতে সহায়তা করবে। আমরা সেই ভাষণটি প্রকাশ করছি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে। দুই পর্বের লেখা–এখানে প্রথম পর্ব। সম্পাদক।]

কমরেডস,

আমি শুনেছি আজকের সন্ধ্যায় আপনারা লেনিন স্মরণসভার আয়োজন করেছেন এবং একজন বক্তা হিসাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি মনে করি, লেনিনের কার্যাবলি সম্পর্কে আমার কোনও তৈরি করা ভাষণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার থেকে ভালো হবে, আমি যদি কিছু ঘটনাবলির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখি, যেগুলি থেকে একজন মানুষ ও নেতা হিসাবে লেনিনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চেনা যাবে। এইসব ঘটনার মধ্যে হয়তো কোনও যোগসূত্র নেই, কিন্তু লেনিন সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করার প্রশ্নে এই যোগসূত্র থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলতে আমি অক্ষম।

পাহাড়ি ঈগল

আমি প্রথম লেনিনের সঙ্গে পরিচিত হই ১৯০৩ সালে। সেটা মুখোমুখি সাক্ষাৎ ছিল না, পরিচয় হয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু সেটাই আমার মধ্যে এত গভীর ছাপ ফেলেছিল যে, আমার সমগ্র পার্টি জীবনে তা কখনওই আমার মন থেকে মুছে যায়নি। আমি সেই সময়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম। ১৮৯০-এর দশকের শেষ দিকে, বিশেষ করে ১৯০১ সালের পর, *ইসক্রা* প্রকাশ পাওয়ার পর লেনিনের বিপ্লবী কার্যাবলি সম্পর্কে আমার যে ধারণা জন্মায়, তার থেকে আমি নিশ্চিত হই যে, লেনিনের মধ্যেই রয়েছে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। সেই সময় আমি লেনিনকে পার্টির নিছক একজন নেতা রূপে দেখিনি, দেখেছি পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রূপে। বুঝেছি, পার্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং পার্টির জরুরি প্রয়োজনকে তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করেন। আমি যখন তাঁকে পার্টির অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তুলনা করেছি, তখন সর্বদা আমার মনে হয়েছে, তাঁর স্থান তাঁর সহকর্মী, যেমন—প্লেখানভ, মার্তভ, আক্সেলরড প্রমুখের চেয়ে অনেক উঁচুতে। লেনিন শুধুমাত্র অনেক নেতাদের একজন ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নেতা, এক পাহাড়ি ঈগল, সংগ্রামে যাঁর কোনও ভয় ছিল না, যিনি রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের অজানা পথে পার্টিকে অবিচল দৃঢ়তায় পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমার এই মনোভাব এতটাই গভীর ছিল যে, আমি আমার একজন বন্ধু যে তখন বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিল, তাঁকে লেনিন সম্পর্কে আমার এই উপলব্ধি লিখে পাঠিয়ে তার অভিমত জানাতে অনুরোধ করেছিলাম। কিছুকাল পর ১৯০৩ সালের শেষ দিকে আমি যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে রয়েছি, তখন সেই বন্ধুর কাছ থেকে একটা উৎসাহব্যঞ্জক জবাব পাই, তার সাথে পাই সরল ভাষায় গভীর অভিব্যক্তিসম্পন্ন লেনিনের একটি নোট, যা থেকে আমি বুঝতে পারি, আমার বন্ধু লেনিনকে আমার চিঠিটি দেখিয়েছিলেন। লেনিনের নোটটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তার মধ্যেই ছিল আমাদের পার্টির বাস্তব কার্যকলাপ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ও নির্ভীক সমালোচনা। তার সাথে ছিল, পার্টির আশু কার্যাবলি সংক্রান্ত সমগ্র পরিকল্পনার একটা সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার বর্ণনা। অত্যন্ত জটিল বিষয়কে এত সহজ ভাষায় ও পরিষ্কারভাবে, এত সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়ভাবে লিখতে পারতেন একমাত্র লেনিনই। তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য যেন ছিল বন্দুকের এক একটি গুলি। এই সহজ অথচ বলিষ্ঠ চিঠিটি আমার মধ্যে এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে দেয় যে, লেনিনই হচ্ছেন আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগল। দুঃখের কথা, সেই সময়ে আমরা যারা গোপনে পার্টির কাজ করতাম, তাদের অভ্যাসবশত বহু চিঠির মতো লেনিনের এই চিঠিটিকেও আমি পুড়িয়ে ফেলি। এজন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারিনি। লেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই সময় থেকেই।

বিনয়

আমার সঙ্গে লেনিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিনল্যান্ডের তামারফস বলশেভিক সম্মেলনে। আমি আশায় ছিলাম, আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগলকে, মহৎ মানুষটিকে দেখব। এ শুধু এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখার আশা নয়, আমি কল্পনা করেছিলাম লেনিন একজন বিরাট চেহারারও মানুষ হবেন। ফলে বুঝতেই পারছেন, এত আশা ও কল্পনা করার পর আমি যখন একজন সাধারণ চেহারার মানুষকে দেখলাম, গড় উচ্চতার মানুষের চেয়েও যাঁর উচ্চতা কম, আক্ষরিক অর্থেই কোনও ভাবে যাঁকে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করা যায় না, আমি কতটা হতাশ হয়েছিলাম।...

এ কথা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে, একজন 'বড় মানুষ' সভায় দেরিতে আসবেন, যাতে সমবেত অন্যেরা তাঁর আসার জন্য অধীর আগ্রহে, পথ চেয়ে থেকে এবং তারপর সেই 'বড় মানুষ' যখন সভায় ঢুকবেন, তখন সমবেত মানুষদের মধ্যে ফিসফিস শুরু হয়ে যাবে—চুপ, চুপ, উনি আসছেন'। এই ধরনের আচরণ আমার কাছে খুব একটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি, কারণ এর দ্বারা মানুষটি সম্পর্কে একটি ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে, শ্রদ্ধা সম্মান গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় যখন আমি দেখলাম, প্রতিনিধিরা পৌঁছবার আগেই লেনিন সম্মেলনে পৌঁছে গিয়েছেন এবং হলের একটা কোণে নিজের স্থান করে নিয়ে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে অত্যন্ত সাদামাটা আলাপচারিতায় নিয়োজিত আছেন, আমার মধ্যেকার হতাশা আপনারা বুঝতেই পারছেন। আপনাদের সামনে এ সত্য আমি গোপন করব না যে, সেই সময় মনে হয়েছিল, লেনিনের এই আচরণ কতগুলো আবশ্যক নিয়মকানুনকে লঙ্ঘন করেছে। একমাত্র পরবর্তীকালেই আমি উপলব্ধি করি যে, এই যে সরল সাদাসিধে জীবন, এই যে বিনয়, নিজেকে অলক্ষ্যে রাখার চেষ্টা, অথবা বলা যায়, অন্ততপক্ষে নিজেকে জাহির না করা, নিজের উচ্চ অবস্থানকে জোরালোভাবে সামনে তুলে না ধরা—এই বৈশিষ্ট্যই ছিল নতুন নেতা হিসাবে সাদাসিধে সাধারণ জনগণের, মানবজাতির নিচুতলার মানুষের নেতা হিসাবে লেনিন চরিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক।

যুক্তির শক্তি

ওই সম্মেলনে লেনিন দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিয়েছিলেন। একটি ছিল বর্তমান পরিস্থিতির উপর, আরেকটি ছিল কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নে। দুঃজনকভাবে ওই ভাষণগুলি সংরক্ষিত হয়নি। ওই ভাষণ সমগ্র সম্মেলনকে উদীপ্ত করে উৎসাহের তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। নিজ প্রত্যয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা, যুক্তির সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা, বোঝার মতো সংক্ষিপ্ত বাক্যে সহজ উপস্থাপনা, কৃত্রিমতা ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গির অনুপস্থিতি—এই বৈশিষ্ট্যগুলিই লেনিনের ভাষণকে 'পার্লামেন্টারি' বাগ্মীদের প্রথাগত ভাষণ থেকে আলাদা করে মানুষের কাছে আদরণীয় করে তুলেছিল। কিন্তু সে সময় আমাকে যা সম্মোহিত করেছিল, তা লেনিনের ভাষণের এই দিকটা নয়। আমি সম্মোহিত হয়েছিলাম, তাঁর বক্তব্যের ভিতরকার যুক্তির দুর্দমনীয় শক্তির দ্বারা। যদিও তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত মাপা, কিন্তু তা দিয়েই তিনি সমবেত শ্রোতাদের মনকে পুরোপুরি আকৃষ্ট করে রাখতেন, ধীরে ধীরে তাদের প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন এবং শেষপর্যন্ত শ্রোতাদের উপর তাঁর যুক্তির পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতো। আমার মনে পড়ে, বেশ কিছু প্রতিনিধি বলেছিলেন, 'লেনিনের ভাষণের যুক্তি যেন অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো, যা তোমাকে ধীরে ধীরে বেড়ির মতো জড়াবে এবং শেষপর্যন্ত এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে যা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তোমার থাকবে না। হয় তুমি আত্মসমর্পণ করবে, নয়তো চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিতে হবে। আমি মনে করি, লেনিনের ভাষণের এই দিকটিই ছিল বাগ্মী হিসাবে তাঁর শিল্পীসত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য।

পরাজয়ে নির্ভীক

দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে লেনিনের দেখা হয় ১৯০৬ সালে পার্টির স্টকহোম কংগ্রেসে। আপনারা জানেন, ওই কংগ্রেসে বলশেভিকরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং তাদের পরাজয় ঘটেছিল। সেইবারই প্রথম আমি লেনিনকে পরাজিতের ভূমিকায় দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি সে জাতের নেতা ছিলেন না, যাঁরা কোনও পরাজয়ের পর অজুহাত দেন, অভিযোগ নিয়ে কাঁদুনি গান এবং বল-ভরসা হারিয়ে বসেন। বরং পরাজয় লেনিনকে অফুরন্ত শক্তির উৎসে পরিণত করত, যা তাঁর সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করে নতুন লড়াইয়ে ও ভবিষ্যৎ বিজয় অর্জনে অনুপ্রেরণা দিত। একটু আগেই আমি বললাম, সেই কংগ্রেসে লেনিন পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কী জাতের পরাজয় ছিল এটা? সেটা আপনারা সে সময় শুধু তাঁর বিরোধীদের—প্লেখানভ, আক্সেলরড, মার্তভ এবং অন্যান্যদের চেহারা-ছবি দেখলেই বুঝতে পারতেন। তাঁরা জয়ী, অথচ তাঁদের মুখচোখ হয়ে গিয়েছিল পাংশু। মেনশেভিকবাদ সম্পর্কে লেনিনের নির্দয় সমালোচনা তাঁদের যেন রক্তশূন্য করে দিয়েছিল। আমার স্মরণে আছে, আমরা বলশেভিক প্রতিনিধিরা একত্রে জড়ো হয়ে লেনিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম তাঁর নির্দেশের জন্য। কোনও কোনও ডেলিগেটের বক্তব্যের মধ্যে ক্লান্তি এবং হতাশা ঝরে পড়েছিল। আমার মনে আছে, এই ধরনের ভাষণের জবাবে লেনিন তীব্র ভাষায় দাঁত চেপে বলেছিলেন, 'কমরেডস', কাঁদুনি গাওয়া নয়, আমরা জয়ী হবই। কারণ আমরা সঠিক'। ঘ্যানঘ্যানে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ঘৃণা, আমাদের নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস এবং জয় সম্পর্কে আস্থা—এটাই লেনিন আমাদের দিয়েছিলেন। আমরা অনুভব করেছিলাম যে, বলশেভিকদের পরাজয় সাময়িক। অদূর ভবিষ্যতে তারা জয়ী হবেই। 'পরাজয় নিয়ে কাঁদুনি নয়'—এটাই ছিল লেনিনের কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য, এটাই লেনিনের চারপাশে আমৃত্যু অবিচল এবং নিজ শক্তি সম্পর্কে আস্থাবান এক সংগ্রামী বাহিনীকে সমবেত হতে সাহায্য করেছিল।

আত্মগরিমা নয়

পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসে অর্থাৎ ১৯০৭ সালের লন্ডন কংগ্রেসে বলশেভিকরা নিজেদের বিজয় প্রমাণ করল। এই প্রথম আমি লেনিনকে জয়ীর ভূমিকায় দেখলাম। জয় কিছু নেতার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাদের দাম্ভিক ও অহংকারী বানিয়ে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শুরুই করে জয়ী ভাব নিয়ে এবং কত জয় তারা অর্জন করেছে, তার বর্ণনা শুনিয়ে। এ ধরনের নেতাদের সাথে লেনিনের বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। বরং যে কোনও বিজয়ের পর বিশেষ করে তিনি আরও বেশি সতর্ক ও সাবধানী হয়ে যেতেন। আমার মনে পড়ে, লেনিন বারবার প্রতিনিধিদের বোঝাচ্ছিলেন, 'প্রথম কথা মনে রাখতে হবে, বিজয়ে মাথা খারাপ করলে এবং গর্বোদ্ধত হলে চলবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, বিজয়কে সংহত করতে হবে। তৃতীয় কাজ হচ্ছে, শত্রুকে শেষ আঘাত দেওয়া। কারণ, সে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি'। যে সমস্ত প্রতিনিধিরা খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলছিলেন, 'মেনশেভিকদের সঙ্গে লড়াই সাঙ্গ হয়ে গেল', তিনি তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এ সত্য দেখাতে লেনিনের কোনও অসুবিধাই হয়নি যে, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে মেনশেভিকদের শিকড় তখনও ছিল, তাদের বিরুদ্ধে দক্ষতার সাথে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে, নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা এবং অপরের, বিশেষ করে শত্রুর শক্তিকে কমিয়ে দেখার অভ্যাস বদলাতে হবে। 'বিজয়ে গর্বোল্লাস নয়'—এটি ছিল লেনিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এটাই শত্রুর শক্তিকে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে এবং আচমকা সম্ভাব্য বিপদ থেকে দলকে আগাম প্রস্তুত করে রাখতে লেনিনকে সাহায্য করেছিল।

অফিসারদের ঘেরাও করো, যুদ্ধ বন্ধ করো, অস্ট্রো-জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়কে নিজেদের হাতে তুলে নাও।'

এটা ছিল 'অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া'। কিন্তু লেনিন এই 'ঝাঁপ' থেকে বিরত হলেন না, বরং ঝাঁপ দিতে ব্যগ্র হলেন। কারণ তিনি জানতেন, সেনারা শান্তি চাইছিল এবং পথের সমস্ত বাধা বিদেয় করে তারা শান্তি জয় করে আনবে। তিনি জানতেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতি অস্ট্রো-জার্মান সৈন্যদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তির জন্য যে কামনা, তাকেই এই পদ্ধতি উৎসাহিত করবে। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে নিখুঁতভাবে সঠিক প্রমাণ হয়েছিল। একজন প্রতিভাবানের অন্তর্দৃষ্টি আসন্ন ঘটনাবলির ভিতরকার ক্রিয়াকর্মকে অত্যন্ত দ্রুত বুঝতে পারার ক্ষমতা—এই ছিল লেনিনের গুণ। এটাই তাঁকে সঠিক রণনীতি নিরূপণ করতে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের আঁকাবাঁকা পথে সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ করতে সক্ষম করেছিল।

নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা

দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে পার্টি নেতারা গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে একটা শক্তি বা ক্ষমতা যার হিসাব একজন নেতাকে করতেই হয়। এই বিষয়টা লেনিন দলের অন্যান্য নেতার চেয়ে কম বুঝতেন না।...

(চলবে)

কেরানীগঞ্জে শ্রমিকের মৃত্যু : শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক প্রধান ও স্কপ নেতৃবৃন্দের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

◆ঘটনার জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত করা
◆ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান
◆কর্মপরিবেশ নিরাপদ করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের দাবি

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক প্রধান ও বিলসের প্রধান নির্বাহী সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, আহসান হাবিব বুলবুল, স্কপ নেতা মাহবুবুল আলম ও শামীম আরা-সহ একটি প্রতিনিধি দল ৬ এপ্রিল '২৬ কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে গ্যাসলাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৬ জন শ্রমিক ভস্মিভূত হওয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দেন এবং ওই এলাকার সকল কারখানার কর্ম পরিবেশ নিরাপদ করতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার আহবান জানান।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে নেতৃবৃন্দ অবগত হন যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় গ্যাসলাইটার কারখানার বহির্গমন পথ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনেক শ্রমিক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আগুনে পুড়ে মারা যায়। নিহত শ্রমিকরা এমনভাবে দগ্ধ হয়েছে যে তাদের পরিচয় সনাক্ত করা না যাওয়ায় মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারখানায় বেশ কয়েকজন শিশু শ্রমিক কাজ করতো এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণে কাজ হারানো শ্রমিকদের কারো কারো তিন মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ, লক্ষ্য করেন ঘটনাস্থলের আশেপাশে আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শ্রমিক এবং এলাকাবাসী ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ ও বসবাস করছে। নেতৃবৃন্দ, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং দ্রুততম সময়ে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে পরিচয় সনাক্ত করে মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর, দায়ীদের চিহ্নিত করে শাস্তি ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন থেকে তাৎক্ষণিক বরাদ্দ দিতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের যে সহযোগিতা দেওয়া হবে তাকে অনুদান হিসাবে গণ্য করতে হবে, ক্ষতিপূরণ কারখানা মালিকের কাছ থেকেই আদায় করতে হবে। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে অথচ অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ প্রায় অনুপস্থিত। ফলে কর্মচলাকালীন সময়ে কারখানার বহির্গমন পথে তালা দেওয়া কিংবা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে আইন লঙ্ঘনের পুণরাবৃত্তি ঘটছে।

নেতৃবৃন্দ, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যুক্ত করে বিভিন্ন স্তরে মনিটরিং সেল গঠনের আহবান জানান।

বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের আত্মপ্রকাশ

ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়ন, শোভন কর্মপরিবেশ ও চাকরির নিরাপত্তা দাবি

জাহাঙ্গীর হোসেন সভাপতি ও ডা. মনীষা চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

৩ এপ্রিল '২৬ ঢাকা সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে এক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের প্রথম জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন 'বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন'-গঠন উপলক্ষে সাধারণ সভার পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে ঘোষিত মজুরি স্কেল বাস্তবায়ন, ওষুধ শিল্পের শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ তহবিল চালুসহ শোভন কর্মপরিবেশ ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিল পরবর্তী সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের (প্রস্তাবিত) সাধারণ সভার আহবায়ক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের (প্রস্তাবিত) অন্যতম সংগঠক ডা. মনীষা চক্রবর্তী। আরও বক্তব্য রাখেন ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের ৭টি রেজিস্ট্রার্ড ও ১টি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প এখন দেশের একটা সমৃদ্ধ ও বিকাশমান খাত হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দেশীয় চাহিদার ৯৮% মেটাচ্ছে। দেশীয় বাজারে ওষুধের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ এখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রোমানিয়া, ডেনমার্ক, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, নেপাল, চীন, ভিয়েতনাম, মিয়ানমারসহ বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। কিন্তু এই উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিক–যারা কারখানায় দিনরাত শ্রমদিয়ে ওষুধ উৎপাদন করেন, যাদের শ্রমে বাঁচে লাখো প্রাণ কিন্তু তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

যারা মানুষের জীবন রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ওষুধ উৎপাদন করেন, তাদের নিজেদের বাঁচার মতো মজুরি নেই। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে, অথচ ওষুধের দাম বাড়লেও বাড়ে না তাদের মজুরি। কাজের নিরাপত্তা নেই অথচ ৮ঘন্টার অধিক সময় কাজ করতে হয়।

অনেক কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নেই। রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করতে গিয়ে বা কেমিক্যাল মিশানোর সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত সরঞ্জাম পিপিই না থাকায় শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তাদের নিত্যসঙ্গী। আন্তর্জাতিক মানের ওষুধ রপ্তানি করলেও উৎপাদনকেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের কল্যাণের মান উপেক্ষিত।

শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নেই, চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী নিয়োগের কারণে শ্রমিকদের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছে। চাকরি হারানোর ভয়ে তারা ন্যায্য দাবি তুলতেও ভয় পায়। শ্রম আইন অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যাল শ্রমিকরা চাকরির নিরাপত্তা, ওভারটাইম ভাতা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই খাতের শিল্পের সংখ্যা বাড়ছে, মুনাফা ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু শ্রমিকের জীবনমান, সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ছে না। তাই সরকার ও মালিকপক্ষকে মানসম্মত মজুরি কাঠামো ঘোষণা ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বাধা অপসারণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন হলো শ্রমিকদের আইন স্বীকৃত ঐক্যবদ্ধ শক্তির সংগঠন, যার মাধ্যমে শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার, নিরাপদ কাজের পরিবেশ, মজুরি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ তৈরি হয়, অধিকার আদায় ও রক্ষা করা যায়। শ্রমিকরা সচেতন হলে এই অন্যায় শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রাম করবেই, এটা মালিকরা জানে। সে কারণে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পথে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। শ্রম আইন, বিধিমালা, প্রশাসন-পুলিশ, মাস্তান ও দালালদের মাধ্যমে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সংগঠনে বাধা দেয়। কারণ সংগঠিত শ্রমিককে ঠেকানো কঠিন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মালিকরা ওষুধ শিল্প থেকে লাভ করে ৬০ হাজার কোটি টাকা পাচার করার ঘটনা এদেশে ঘটেছে কিন্তু শ্রমিকরা তাদের আইনস্বীকৃত অধিকার–চাকরির নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ পায়নি। নেতৃবৃন্দ ওষুধ শিল্পের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার জন্য দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যাবার জন্য ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের কাছে আহবান জানান।

সাধারণ সভায় মো. জাহাঙ্গীর হোসেনকে সভাপতি ও ডা. মনীষা চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের ২৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নির্বাচিত হয়।

কার্ল মার্কসের সমাধিস্থলে বক্তৃতা : ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

জন্ম : ৫ মে ১৮১৮; মৃত্যু : ১৪ মার্চ ১৮৮৩

[১৪ মার্চ ২০২৬ ছিল মনীষী কার্ল মার্কস-এর ১৪৩তম মৃত্যুদিবস। গভীর শ্রদ্ধা। মৃত্যুর পর মার্কসকে উত্তর লন্ডনের হাইগেট সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মার্কস-এর সমাধিতে যে বক্তব্য রাখেন তা কার্ল মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ ভ্যানগার্ড পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।]

১৪ মার্চ, বেলা পৌনে তিনটায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন—কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য।

এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হলো। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা অচিরেই অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি-বিজ্ঞান, কলা-ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হলো সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যানধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু শুধু এই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হলো উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কসের চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে- এবং তিনি চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনোটাই ওপর ওপর নয়—তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হলো বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিশীল বিপ্লবী শক্তি। কোনো একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়তো তখনো পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যতই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনো আবিষ্কার শিল্পে এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ এবং সম্প্রতি মার্সেল দ্রেপ্রের আবিষ্কারগুলি তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন।

কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোন না কোন উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রামের। এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম Rheinische zeitung (১৮৪২), প্যারিসের vorwarts (১৮৪৪) পত্রিকা, Deutsche Brusseler zeitung (১৮৪৭), Neue Rheinische (১৮৪৮-৪৯), New york Tribune (১৮৫২-৬১) পত্রিকা এবং এছাড়া একরাশ সংগ্রামী পুস্তিকা, প্যারিস, ব্রাসেলস এবং লন্ডনের সংগঠনে তাঁর কাজ এবং শেষে, সর্বোপরি মহান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন—এটা এমন একটা কীর্তি যে আর কোন কিছু না করলেও শুধু এইটুকুর জন্যই এর প্রতিষ্ঠাতা খুবই গর্ববোধ করতে পারতেন।

তাই, তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বৈচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী দু'ধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীলই বা উগ্র-গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে। এসব কিছুই তিনি ঠিক মাকড়শার ঝুলের মতোই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন। আর আজ সাইবেরিয়ার খনি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ ও আমেরিকার সব অংশে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে, শোকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। আমি সাহস করে বলতে পারি যে, মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ।

কমরেড স্তালিন স্মরণে

জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮; মৃত্যু : ৫ মার্চ ১৯৫৩

[৫ মার্চ ২০২৬, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নির্মাতা ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড স্তালিনের ৭৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে তাঁর লেখা 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস', যা প্রাভদা, সংখ্যা ৫৬-এ ছাপা হয়। লেখাটি *ভ্যানগার্ড* পাঠকের জন্য উপস্থাপন করা হলো।]

মানবজাতির ইতিহাসে নিপীড়িতদের এমন একটি মহান আন্দোলন নেই যাতে শ্রমজীবী নারীরা অংশগ্রহণ করেননি। শ্রমজীবী নারীরা নিপীড়িতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়েও কোনো সময়ই মুক্তির আন্দোলনে সুমহান পথ থেকে দূরে থাকেননি, থাকতে পারেনওনি। এটা জানা কথা—দাসদের মুক্তির আন্দোলনে লাখো নারী শহিদেরা ও বীরাঙ্গনারা সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভূমিদাসদের মুক্তির সংগ্রামে সৈনিকদের মধ্যে লাখ লাখ শ্রমজীবী নারীরা সমবেত হয়েছিলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে, নিপীড়িত জনগণের মুক্তি অভিযানের প্রবলতম এই আন্দোলনের পতাকাতলে মেহনতি, নারীরা লাখে লাখে সমবেত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি-আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য—তারই স্বাক্ষর বহন করছে, তার মহান ভবিষ্যতের আগমনের বার্তা বহন করে আনছে।

মেহনতি নারীরা-শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণির একটি বিশাল মজুত বাহিনী। জনসমষ্টির পুরো অর্ধেকই হচ্ছেন এই বাহিনী।

শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে বা বিরুদ্ধে যেদিকে তাঁরা যাবেন, তা দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের জয়পরাজয় এবং শ্রমিক শক্তির জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে। তাই, শ্রমিকশ্রেণির এবং তার অগ্রসর বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কাজই হলো নারীমুক্তির, শ্রমজীবী ও কৃষক নারীদের মুক্তির জন্য, বুর্জোয়াশ্রেণির প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য, রাজনৈতিকভাবে তাদের সচেতন ও সংগঠিত করে শ্রমিকশ্রেণির পতাকাতলে সমবেত করার জন্য অবিচল সংগ্রাম পরিচালনা করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস মেহনতি নারী সমাজের এই মজুত বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে নিয়ে আসারই একটি মাধ্যম।

কিন্তু শ্রমজীবী নারীরা একটি মজুত বাহিনী মাত্র নয়। শ্রমিকশ্রেণি যদি একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তাদের বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণির একটি যথার্থ বাহিনী হিসেবেই গড়ে তোলা যায় এবং তা গড়ে তুলতে হবেই। শ্রমজীবী নারীদের মজুত এই বাহিনী থেকে শ্রমিকশ্রেণির মহান সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি কর্মরত শ্রমজীবী ও কৃষক নারীদের একটি বাহিনী গড়ে তোলাই হলো শ্রমিকশ্রেণির দ্বিতীয় এবং নির্ধারক এবং কর্তব্যকর্ম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে শ্রমজীবী নারী ও কৃষক নারীদের নিয়ে গঠিত শ্রমিকশ্রেণির এই মজুত বাহিনীটিকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি-আন্দোলনের একত্রিত সক্রিয় সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তর সাধনের মাধ্যম করেই তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৬, ৮ মার্চ, ১৯২৫।

বি.এম কলেজের ছাত্রী আনিতা হত্যার বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল

ছাত্র ফ্রন্ট ও মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে বি. এম কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রী সানজিদা কবির আনিতা হত্যার বিচারের দাবিতে ২৬ এপ্রিল অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি মাফিয়া বেগম ও পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, নারীনেত্রী সালমা নাছরিন, ইসমত আরা, ছাত্র ফ্রন্ট মহানগর আহ্বায়ক সুজন আহমেদ, সোনারগাঁও টেক্সটাইল লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মো. ইমরান, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগঠক লামিয়া সাইমুন, ছাত্র ফ্রন্টের নাজলা আক্তার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ২৩ এপ্রিল মুনশি গ্যারেজে মাইনুল ইসলাম হিমুর বাসা থেকে সানজিদা কবির আনিতার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আনিতা বি. এম কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল। অভিযুক্ত মাইনুল ইসলাম হিমুর নামে এর আগেও ঝালকাঠিতে তার প্রথম স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ ছিল। আনিতার সাথে হিমুর সম্পর্ক থাকলেও এই ঘটনা জানার পর আনিতা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে তাকে হিমুর বাসায় ডেকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার অভিযোগ ওঠে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হিমুসহ আনিতা হত্যার সাথে জড়িত সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় এনে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

শ্রম অধ্যাদেশের প্রস্তাবনা পরিমার্জন করে সংসদে অনুমোদনের আহ্বান

সংবাদ সম্মেলনে

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ

শ্রমিকদের নেতৃত্ব নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বমূলক স্বাধীন ও ক্ষমতা করার প্রস্তাবনা সংশোধন, শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ '২৫ অনুমোদনের দাবি জানিয়ে ৬ এপ্রিল ঢাকায় তোফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়া হলে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতেই কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে গ্যাস লাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৬ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ, ঘটনার জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তার-শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, সঞ্চলনা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন স্কপের অপর যুগ্ম সমন্বয়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল। প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন স্কপ নেতা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মো. আবু জাফর ও সাধারণ সম্পাদক সাকিল আক্তার চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের সভাপতি চৌধুরী আশিকুল আলম, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাঈফুজ্জামান বাদশা, শ্রমিকনেতা নঈমুল আহসান জুয়েল, বাদল খান, আবুল কালাম, শহিদুল্লাহ বাদলসহ ব্যাংক-বিমা, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিবিএ ও বিআরটিসি শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ-র নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন শ্রম আইনের গণতান্ত্রিক সংশোধনীর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। শ্রমিক আন্দোলনের দাবির মুখে গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রকাশিত হয়, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল প্রতিক্ষিত ছিল। এ অধ্যাদেশে বিদ্যমান শ্রম আইনে ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জন সাধিত হয়েছে, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষয়াবলি শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের অধিকারকে প্রসারিত করেছে।

উক্ত অধ্যাদেশে শ্রম আইনের প্রযোজ্যতার বিস্তৃতি, শ্রমিকের সংজ্ঞার সম্প্রসারণ, মালিকের সংজ্ঞার সুনির্দিষ্টকরণ, ব্যবস্থাপনামূলক, প্রশাসনিক ও তদারকি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি গঠন বা তাতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া লে-অফ ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি তহবিল, বৈষম্য, হয়রানি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি, শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন, মাতৃত্বকালীন সুবিধার কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন অপরাধের দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি—এসব পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ও প্রশংসনীয়।

উল্লিখিত ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু সংশোধন এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারকে সংকুচিত করার আশঙ্কা তৈরি করে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে প্রাক্তন সদস্যদের নেতৃত্বে নির্বাচিত হওয়া সংশ্লিষ্ট বিধান (ধারা ১৮০ (১-খ এর শর্ত)), বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ বিলুপ্তকরণ (ধারা-১৮৪), শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের ও শ্রমিকের পক্ষে যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধির শ্রম আদালতে দরখাস্ত করার অধিকার [ধারা ২০২ (২৪ এর খ ও ঙ)] বিলুপ্তির মাধ্যমে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির ক্ষমতা হ্রাস যা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া শ্রমিক ও মালিকের সংজ্ঞায় কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত মধ্য স্তরের কর্মকর্তাদের শ্রম আইনে সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন গ্রহণের শর্ত আরোপের কৌশল ইত্যাদি সংশোধনসমূহের ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকি ও মৌলিক শ্রম অধিকারও খর্ব হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উল্লিখিত অধ্যাদেশের শ্রমিক অধিকার

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

অতি বৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে হাওরাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান কর

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৩০ এপ্রিল সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে অতি বৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে হাওরাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অতি দ্রুতা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, গত ২৬ এপ্রিল থেকে চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির পানির ঢলে ও দেশের ভেতরের ভারী বর্ষণ ও অপরিকল্পিত বাঁধের কারণে হাওরে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে ধান তলিয়ে গেছে। হাওরের কৃষকদের বোরো ধানই বছরের একমাত্র ভরসা। সে ধান তলিয়ে যাওয়া অর্থ হচ্ছে পুরো বছরের খাদ্য ও জীবিকা সংকটে পড়বে। যারা কিছু ধান কাটতে পেরেছেন, রোদ না থাকায় গোলায় তুলতে পারছেন না, সেগুলোও নষ্ট হওয়ার পথে। ব্যাংক, এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ করে কৃষকরা ফসল ফলায়। ফসল নষ্ট হওয়ায় ঋণ পরিশোধে কৃষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। যেটুকু ফসল পেয়েছে, সিন্ডিকেটের কারণে কম দামে লোকসান দিয়ে মনপ্রতি ৭০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া গোখাদ্য সংকটে গবাদি পশু কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রতিশ্রুতি যেন লোক দেখানো না হয়; দ্রুত দুর্নীতি ও দলীয়করণ মুক্তভাবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোক প্রস্তাব গ্রহণে বাসদের নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৩ মার্চ ২০২৬ সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দণ্ডপ্রাপ্ত স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোক প্রস্তাব গ্রহণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোক প্রস্তাব গ্রহণকালে সরকারদলীয় চিফ হুইপ গণহত্যার সহযোগী স্বীকৃত রাজাকার-যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোক প্রস্তাব গ্রহণের কথা বলেন। পরবর্তীতে আমরা হতবাক হয়ে দেখলাম সংসদের স্পীকার কর্তৃক তা গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত গণচেতনাকে পদদলিত করার এক কলঙ্কময় নজির স্থাপিত হলো। দেশের আপামর জনগণ এ ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধ ও ৩০ লক্ষ শহিদদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে এবং ধিক্কার জানায়।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ ঘটনায় ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গত ৫৪ বছরে এই ভূখণ্ডে সংঘটিত গণ আন্দোলনের চেতনাসমূহকে পদদলিত করা হয়েছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে প্রত্যাশা ছিল এই নাটকের অবসান ঘটবে।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, আমরা অনতিবিলম্বে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের শোক প্রস্তাব থেকে যুদ্ধাপরাধীদের নাম এক্সপাঞ্জ করার দাবি জানাই।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

২৫ এপ্রিল সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার দশম কাউন্সিল শহরে একটি কোচিং সেন্টারে অমিও রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক শাহজাহান আলী, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাসদ জেলা সদস্য উজ্জ্বল বিশ্বাস, ইমরান খান, পলাশ পাল।

কাউন্সিলে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণ। ফলে, পুঁজিবাদী নিয়মে যেমন পণ্য ক্রয়বিক্রি হয়, শিক্ষাও সেভাবেই চলছে। সরকার ছাত্র সমাজের দাবি উপেক্ষা করে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে বরং বছর বছর কমাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক মনন, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল ধারাকে দুর্বল করে, ছাত্রদের চিন্তা-চেতনায় পশ্চাদপদ কূপমণ্ডূক অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন শিক্ষার্থী যে কোনো বিষয়েই প্রশ্ন তুলতে পারে না, যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যার কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ছাত্র ফ্রন্টকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি কেবল সংগঠনিক দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ছাত্রসমাজের মৌলিক অধিকার আদায়, প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশ ঘটানো এবং সামগ্রিকভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের সংগ্রামকে বেগবান করতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা কমিটি সর্বদা সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

১৫ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাউন্সিলে অমিও রহমানকে আহ্বায়ক এবং অলিপ বিশ্বাসকে সদস্যসচিব নির্বাচিত করে। সদস্যরা হলেন,১. সুপ্তি বিশ্বাস ২. মৃন্ময় মন্ডল ৩. জয় মন্ডল ৪. তপু বিশ্বাস ৫. মাসুদ কামাল ৬.সাঈফুল দৌল্লা ৭. রকি ৮. তামিম হাসান ৯. নাহিদ হাসান ১০. হাসিব হোসাইন ১১. সাকলাইন ১২. খলিলুর রহমান ১৩. লিটন পাল।

হাজারো শ্রমিকের মৃত্যুবরণ ও রক্তে ভেজা রানা প্লাজার ধসের ১৩ বছর
নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষ

কর্মস্থলে শ্রমিকের জীবন যেখানে প্রতিমুহূর্তে ঝুঁকিতে ও মরণাপন্ন, ভবন মালিক দায়হীন, কারখানার মালিক সাজাহীন ও সরকার উদাসীন—এমনই এক পরিবেশে বাংলাদেশের কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদন চলছে। মালিক ও রাষ্ট্রের চোখে পোশাকশ্রমিকের জীবন যেমন সস্তা ও মূল্যহীন আর মালিকের চোখ মুনাফার লোভে চকচক করছে।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল। বাংলাদেশের শিল্পকারখানার ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কারখানা দুর্ঘটনা। সাভারের রানা প্লাজা ধসে প্রাণ হারান ১১৩২ জন পোশাকশ্রমিক যাদের মধ্যে ২৯১ জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের সমাধিস্থ করা হয়েছে জুরাইনে কবরস্থানে অচিহ্নিত হিসেবে । আহত হন আড়াই হাজারের বেশি। এটি শুধু একটি দুর্ঘটনা ছিল না—একটি পরিকল্পিত ও কাঠামোগত হত্যাযজ্ঞ। নির্মাণবিধি লঙ্ঘন, কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের চোখ বন্ধ, আর মালিকপক্ষের বেপরোয়া মুনাফালিপ্সা—সব

মিলিয়ে এক শিল্প-গণহত্যার চিত্র দেখল বাংলাদেশের মানুষ ও বিশ্ববাসী।

আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ওঠে আসে, ভবনটিতে আগেই ফাটল ধরা পড়েছিল। কিন্তু মালিক-শ্রমিককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে কাজে পাঠান। দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষ, ছাত্র-শ্রমিক ও সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ করে কী অসহায়ভাবে শ্রমিক মা-বোন ভাইয়েরা ভবনের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করছে। জীবিত উদ্ধার হওয়া অনেকে হাত-পা হারিয়েছেন। পেটের দায়ে কাজ করতে এসে পঙ্গুত্ব বরণ–এ যেন দরিদ্র শ্রমিকের নিত্যদিনের দুঃসহ বাস্তবতার চরম নমুনা।

ঘটনার পর ১৩ বছর
নিরাপত্তা বাড়েনি, বেড়েছে মৃত্যু

রানা প্লাজার পর দেশবাসী আশাকরেছিল —কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটবে, ‘শ্রমিকের মৃত্যুর মিছিল’ বন্ধ হবে, কর্মক্ষম মানুষ আর লাশ হবে না। কিন্তু তার পরের পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা। রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনার হার কিছুটা কমলেও সামগ্রিক শিল্পে-মৃত্যু বেড়েছে। ২০১৯-২০২৪ কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিকের। ট্যাস্ক ফোর্সের হিসাব বলছে, শুধু অনানুষ্ঠানিক খাতেই প্রতিবছর মৃত্যু হচ্ছে আড়াই হাজারের ওপর।

টঙ্গীর রাসায়নিক গুদাম, সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপো, কেরানিগঞ্জের গ্যাসলাইটার কারখানা, হাসেম ফুডের অগ্নিকাণ্ড, শিয়ালবাড়ির বয়লার বিস্ফোরণ–প্রতিটি ঘটনায় আবারও ফুটে ওঠে নিরাপত্তার অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জরুরি বহির্গমন পথ তালাবদ্ধ, অগ্নিনির্বাপণ

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

‘ভূমিকম্প : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রগতিশীল প্রকৌশলী,
পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি সমাজ

দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে ‘প্রগতিশীল প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি সমাজ’ ২৪ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘ভূমিকম্প : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করেছে। সভায় আলোচনা করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারি, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাবিদ খন্দকার নিয়াজ রহমান, বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক স্থপতি ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো.সাখাওয়াত হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ও সূচনা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি প্রকৌশলী মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী ও সভাপরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবীব রুমন।

সূচনা বক্তব্য

সাম্প্রতিক সময়ে ২১ নভেম্বর ২০২৫ সালে ভূমিকম্পে হতাহত ও ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, মাটিতে ফাটল সৃষ্টি, ইত্যাদির কারণে জনমনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। তাতক্ষণিকভাবে অনেকে বহুতল ভবনে থাকাকে অনিরাপদ বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করতে আমরা দেখেছি। উল্লিখিত ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৪; এবং এরপরে ’২৬ সালের ২৫ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৫ ও ১৭ মার্চ ৪টি ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, আমেরিকায় ২ মাত্রা অবধি প্রতিটি ভূমিকম্পের উপাত্ত রাখা হয়, এবং ভূমিকম্পের উপাত্ত যত বেশি রাখা যাবে তত সম্ভাব্য ঝুকি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণী মতামত রাখতে পারবেন। বাংলাদেশে সিসমোগ্রাফ দিয়ে ভূ-কম্পন জরিপের ক্ষেত্রে দূর্বলতা অনেক বেশি যে কারণে ‘ইউ এস জি এস’ এর প্রাপ্ত তথ্যকেও ভিত্তি হিসেবে আলোচনা করতে দেখা যায়। আমাদের জানামতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-তত্ব বিভাগে ১৩টি সিসমোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে ২০০৩ সালে একটি প্রজেক্টে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অর্থ বরাদ্দের অভাবে

সেগুলো আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। আবহাওয়া অধিদপ্তরে রক্ষিত সিসমোগ্রাফের মাধ্যমে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও তার তথ্য সংগ্রহের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য নিয়মিতভাবে দক্ষ জনবল নিযুক্ত থাকে না। এর বাইরে বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সার্ভে নামক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ভূমিকম্পসহ ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে পেশাজীবী ও গবেষকদের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে আমলাতান্ত্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধানে কার্যক্রম পরিচালনা করে গ্যাস-তেলসহ বিভিন্ন সম্পদ অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রায় অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। ভূমিকম্প সম্পর্কে আমাদের বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় বাংলাদেশে নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা তাই অতীব জরুরি।

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তার কারণ জেনে; প্রতিকারের কৌশল নির্ধারণে গাইডলাইন ও সেই অনুযায়ী তার অনুসরণ করার আইন থাকা জরুরি। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ’২০ সালে ভূমিকম্প নিয়ে তিনটি জোনে বিভক্ত করে স্টাকচারাল ডিজাইনের গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষজ্ঞরা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি তাকে পরিবর্তন করার গুরুত্ব তুলে ধরছেন।

বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি গবেষণা যথাযথভাবে না হওয়াকে আমরা প্রধান সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছি। জনগণের মাঝে অন্ধ বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করতে হলে পেশাজীবিদের বিজ্ঞানসম্মত ধারণালব্ধ জ্ঞান সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার বিকল্প নেই। অনর্থক ভীতি ছড়ানো যেমন আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তেমনি সম্ভাব্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করাও চরম নির্বুদ্ধিতা।

প্রতিকারের প্রশ্নে সারা দুনিয়া অনেক অগ্রসর। নিউজিল্যান্ড, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ মহাদেশীয় ফাটলের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে সেখানে বছরে হাজার হাজার ভূমিকম্প হয়। সেই সব দেশে বাসস্থানসহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরিতে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যা ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। যথাযথ ডিজাইন এবং তদনুযায়ি নির্মাণ কার্য বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে পেশাজীবিদের মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী তা প্রতিপালনের আয়োজন নেই বললেই চলে।

খোদ ঢাকা শহরে ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, তদনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে কিনা তার পরিচালনা অসম্পূর্ণ। রাজউক অনুমোদিত স্ট্রাকচারাল ডিজাইনারের স্বাক্ষর থাকা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হলেও প্রতিটি ডিজাইনের ভ্যাটিং (নিরীক্ষণ) করার কোন প্রক্রিয়া এখানে নেই। সকল ভবনের অডিট করার কথা বলা হলেও তা কার্যকর করা হয় নাই। রাজউকের উচিত যারা পরামর্শক হিসেবে কাজ করার অনুমোদনপ্রাপ্ত তাদের মাধ্যমেই ভ্যাটিং করার একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা। একইসাথে ভবন নির্মাণসহ যে কোন বিষয়ে পেশাজীবিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা তৈরি করে প্রত্যেক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার লাইসেন্স দেয়া। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যত দ্রুত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করবে তার মাধ্যমেই আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা, অনিয়ম, প্রতিবন্ধকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে জনকল্যাণের জন্য নিবেদিত হওয়ার বিকল্প নেই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, প্রকৃতির ভয়াল রূপ মোকাবিলার পরেও তা কীভাবে প্রাণঘাতি ও ভয়ানক মানবিক বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে তা আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাবানল, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা আমরা দেখে আসছি। বাংলাদেশে অনিরাপদ ভবন নির্মাণের বিষয় আমাদের পেশাজীবিদের অজানা নয়। ফলে ভূমিকম্প নিয়ে আলোচনার সময়ে ভূমিকম্পের সময়ে মানুষের নিরাপদ অবস্থান কীভাবে নিবে, ভূমিকম্পের পরে আফটার শকের আশঙ্কা ও করণীয়, বিশেষভাবে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যবিষয়ক আলোচনাও জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি এলাকায় দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধার ততপরতায় নাগরিকদের যুক্ত করতে হলে আধুনিক ও উন্নতমানের ক্রেন, বুলডোজার, হ্যামার ড্রিলসহ পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির আয়োজন এবং সেইগুলোর সার্টিফাইড অপারেটর তৈরি, যুবক-যুবতীদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ প্রতিরোধ গ্রুপ তৈরি, দুর্যোগকালীন সম্ভাব্য কার্যক্রমের অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই আয়োজন করা গেলে দেশের মানুষের মাঝে একটা নিরাপত্তার বোধ গড়ে তোলা সম্ভব। দৈব বা পূর্বনির্ধারিত ভেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সেই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কবল থেকে নিস্তার নাই, এই ধারণা বদল করে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

মে দিবস : শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

পণ্য অন্যদিকে শ্রমিকের চলাচল বাড়তে থাকে। ব্যবসার পাশাপাশি বিনিময় হতে থাকে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার।

মানব জাতির ইতিহাস প্রকৃতি এবং সমাজকে মানুষের বিকাশের উপযোগী করে তোলার সংগ্রামের ইতিহাস। মানুষ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ভীষণ গরম, বন্যা-খরা ইত্যাদি মোকাবিলা করে যেমন বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে তেমনি চেষ্টা করেছে প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তা কাজে লাগানোর যাতে তার জীবন নিরাপদ হয়, সুন্দর হয়। পাশাপাশি মানুষ চেয়েছে সবাই মিলে বাঁচতে এবং জীবনকে উন্নত করতে। সে কারণেই সমাজের মধ্যে বৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। প্রকৃতির নিয়ম জানা এবং কাজে লাগানোর জন্য মানুষ হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞানের আর সমাজকে উন্নত করার জন্য চর্চা করেছে সমাজবিজ্ঞানের। এই দুই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যবহার করেছে তার শ্রমশক্তিকে। তাই মানব জাতির ইতিহাস এক অর্থে শ্রমের ইতিহাস। এই ইতিহাসে প্রধান নায়ক শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ ও উপেক্ষা করে সমাজ এগিয়ে যেতে চেয়েছে বলেই বিশ্বব্যাপী বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে দিনে দিনে। একদিকে মাত্র দশ জন মানুষের হাতে পৃথিবীর সকল মানুষের আয়ের সমান সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে অন্যদিকে শত শত কোটি মানুষকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে পাওয়া যাবে? কেন দিনরাত পরিশ্রম করেও কোটি কোটি মানুষের দিন চলে না, আবার কিছু মানুষের সম্পদ উপচে পড়ে? একি অদৃষ্টের লিখন নাকি এর কোন নিয়ম আছে? সম্পদ তৈরি হয় কীভাবে আর সম্পদের মালিকানা চলে যায় কার হাতে? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কল্যাণে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে তারপরও কেন শ্রমজীবী মানুষ পেটভরে খেতে পারে না? জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে তারপরও কেন মানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষের সন্তানেরা? চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ কেন চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত? সবাই মিলে সম্পদ তৈরি করে তারপরও কেন মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, কখনো ধর্ম নিয়ে, কখনো নারী পুরুষের, কখনো গায়ের রঙ নিয়ে আবার কখনো ভাষা নিয়ে? খনি থেকে কয়লা তোলে শ্রমিক, সে কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হলে এর সুফল কি সকল মানুষ ভোগ করে না? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল এর কারণ হলো শোষণ। শোষণ কীভাবে হয়? শ্রমিকের যে শ্রমের ফলে সম্পদ তৈরি হয় সেই শ্রমের ন্যায্য দাম শ্রমিক পায় না। যেটুকু তাকে ঠকানো হয় সেটাই মুনাফা হিসেবে কারখানা মালিক বা ব্যবসার মালিকের হাতে চলে যায়। ফলে শ্রমিক যতটুকু বঞ্চিত হয় ততটুকুই মালিকদের হাতে সঞ্চিত হয়। এই নিয়মটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শ্রমিকের না পাওয়া মজুরিই মালিকের মুনাফার ভিত্তি। মুনাফা বাড়াতে মজুরি কমাতেই হবে তাদেরকে। কিন্তু মজুরি কমালে শ্রমিকের কেনার ক্ষমতা কমে যায়, কম খাওয়া শ্রমিকের শুধু কর্মক্ষমতা কমে তাই নয়, বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি কমে যায়। যার আরেক নাম বাজার সংকট।

মজুরির জন্য লড়াই শ্রমিকের দীর্ঘদিনের। বাঁচার জন্য, কাজ করার জন্য, সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্য, পোশাক-ঘর, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রমশক্তির বিনিময়ে মজুরি আর মজুরির টাকায় তাঁর প্রয়োজন মেটানো একটা আর একটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মজুরি কম হলে তাঁর প্রভাব পড়ে সবকিছুর ওপর। তাঁর খাওয়া কমে আর কমে যায় জীবনের সব অধিকার। তাহলে কী উপায়? মালিকেরা বলে বেশি কাজ করলে বেশি মজুরি মিলবে। কিন্তু কত বেশি কাজ করতে হবে একজন শ্রমিককে? সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এমনকি তাঁর চেয়েও বেশি সময় কাজ করতে হবে। ১৪-১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করে বাসায় ফিরে আবার ঘুম ঘুম চোখে ছুটতে হবে কাজের জন্য। এটা কি মানুষের জীবন? যে নারীর সাথে জীবন জড়িয়ে সংসার গড়ে তোলে, যে সন্তানের জন্য রোজগার বাড়াতে চায়, কাজের চাপে সেই স্ত্রী সন্তানের সাথেই দেখা হওয়ার সুযোগ মেলে না শ্রমিকের। যে বাড়ি তার বিশ্রামের স্থান, নিরাপত্তা হওয়ার কথা সেই বাড়িভাড়া জোগাড় করতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। প্রাণ ধারণের খাবার, মাথা গোঁজার ঠাঁই, নিতান্ত না হলেই নয় এমন পোশাক, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সন্তানের ভবিষ্যৎ আর নিজের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তার কথা ভেবে শ্রমিক ছুটে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু প্রাপ্তি ঘটে কতটুকু আর শ্রম দিতে হয় কতক্ষণ?

শ্রমিকের নিংড়ে নেয়া শ্রমে যখন সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে তা দেখে বিক্ষোভ জমে শ্রমিকের বুকে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা প্রথমে ভেবেছিল কারখানাই তাদের প্রধান শত্রু কারণ এখানেই সে শোষিত হতে পারে। আর ম্যানেজাররাই আসলে শয়তান, তারাই তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করে। ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক কারখানা ভেঙে আর মালিক ম্যানেজার হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চাইলো। তাঁরা দখল করে নিতে চাইলো শহর-নগর। ১৮৩২-৪৮ সালে ইউরোপ জুড়ে শ্রমিক বিক্ষোভ আর ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন তার রক্তাক্ত উদাহরণ। এইসব আন্দোলনের অন্তরালে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকরা বুঝতে পারলেন, ব্যক্তি হত্যা আর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে সমাধান আসবে না।

রক্তক্ষয়ী এইসব লড়াইয়ের পাশাপাশি এই ভাবনাও জন্ম নিতে থাকলো যে, কাজের সময় কমাতে হবে, এমন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে যাতে জীবন বিকশিত হতে পারে। ফলে কাজের সময় কমানো আর মানসম্মত মজুরি নির্ধারণ করার দাবি একই সূত্রে গাঁথা হয়েছিল। শিল্প বিপ্লব বাড়িয়েছে উৎপাদনের গতি। শ্রমিককে টেনে এনেছে কারখানায়, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়েছে বহুগুণ, শ্রমশক্তিকে পণ্য করেছে আর শিল্প মালিকদের মুনাফার পাহাড় গড়ার পথ খুলে দিয়েছে। মুনাফা বাড়াতে হলে শুধু উৎপাদন বাড়ানোই যথেষ্ট নয়, পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতায় জিততে হলে উৎপাদন খরচ কমানোও জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে উৎপাদন যন্ত্রের আধুনিকায়ন আর শ্রমিকদের দীর্ঘসময় খাটাতে কর্ম ঘণ্টা বাড়ানো ছাড়া মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর আর কোন সহজ পথ নেই। তাই সর্বোচ্চ মুনাফা বাড়াতে সর্বোচ্চ শ্রম শোষণের জন্য সকল ধরনের নিপীড়নের পথ তারা গ্রহণ করতে শুরু করলো। ফলে কারখানার শ্রম শোষণ এবং অসহ্য যন্ত্রণা শ্রমিকদের প্রতিবাদের পথ রচনা করে দিল।

মুনাফা বাড়ানোর মানসিকতা যেমন মালিকদের মধ্যে শোষণের ঐক্য তৈরি করে তেমনি অধিকারের চেতনা শ্রমিকদের মধ্যেও প্রতিবাদী সম্পর্কের বন্ধন তৈরি করে। বঞ্চনার বেদনা ভুলিয়ে দেয় ভাষা ও অঞ্চলের পার্থক্য। তাই ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষেরা আওয়াজ তুলেছিলো কর্মঘণ্টা কমাও। ইউরোপ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংগঠনগুলো একই লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে থাকে। সংগঠিত হতে থাকে একের পর এক ধর্মঘট। সব আন্দোলনেই দাবি ওঠতে থাকে আট ঘণ্টা কাজের দিন ঘোষণা কর। গড়ে ওঠতে থাকে আট ঘণ্টা শ্রম সমিতি। কাজের সময় আট ঘণ্টা করার এই দাবির অন্তরালে যে মুক্তির আকুতি ছিল তা তুলে ধরেন কার্ল মার্কস। তিনি বলেন, আট ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবির অন্তরালে ছিল ন্যায্য মজুরির আকাঙ্ক্ষা। স্বল্প মজুরি আর দীর্ঘসময় কাজ এই দ্বিমুখী আঘাতে পর্যুদস্ত শ্রমিকদের মুক্তির স্বপ্ন তুলে ধরেছিল মে দিবসের লড়াই।

রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে আট ঘণ্টা কর্ম দিবসের আইনি স্বীকৃতি এলেও এখনও বাস্তবে শ্রমিকদের জীবন মজুরির ফাঁদেই আটকে আছে। মজুরি কম বলে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় আবার অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয় বলে জীবন বিকাশের আর কোন পথ খোলা থাকে না। ফলে স্বল্প দক্ষতা, স্বল্প মজুরি এই চক্রে আটকে পড়েছে শ্রমিকেরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্থায়ী এবং অনানুষ্ঠানিক কাজের বিপুল বিস্তার। মাসিক মজুরি নয়, দৈনিকও নয় এখন চুক্তিভিত্তিক, ঘণ্টাভিত্তিক কাজেই যুক্ত হয়েছে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। তাদের কাজ অনিশ্চিত, মজুরি স্বল্প, সংগঠিত নয় বলে দাবি উত্থাপন এবং আদায় করার সুযোগ নেই। একটা দেশের ৮০ শতাংশের বেশি শ্রমজীবী মানুষ যদি এই ধরনের শ্রমিক হয় তাহলে অর্থনীতিতে তার প্রভাব যেমন পড়বে, কর্মসংস্কৃতি এবং রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। আউট সোর্সিং এবং দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা এর নির্মম দৃষ্টান্ত। এদের কর্ম ঘণ্টা-মজুরি, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সবই অনিশ্চিত। এর বাইরে হালকা যানবাহন চালক, গৃহ শ্রমিক, নিরাপত্তা প্রহরী, ইট ভাটার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা চালক এমন কত ধরনের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে শ্রমিকরা তার ইয়ত্তা নেই।

শ্রমিকদের মজুরি কম এটা সবাই একভাবে জানেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ মাত্র ২ লাখ টাকা, এটা কি শ্রমিকের জীবন যে কত উপেক্ষিত তার প্রমাণ নয়? দেশের জিডিপি বাড়ছে, একজন মানুষের মাথাপিছু আয় এখন সাড়ে তিন লাখ টাকা আর দেশের উৎপাদনের চাকা ঘোরায় যে শ্রমিক তিনি মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ টাকা এটা কি শ্রমিকদের প্রতি চরম উদাসীনতার পরিচায়ক নয়?

ফলে মে দিবসের আহ্বান হোক, কাজ, ন্যায্য মজুরি ও নিরাপত্তা শ্রমিকের জীবন যেন মর্যাদাপূর্ণ হয়। প্রতিটি শ্রমিকের কার্ড দিয়ে তার পরিচয় ও অধিকার সুনিশ্চিত করা হোক। দেশের ৭ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিকের জীবন যেন নিরাপদ হয়, তাদের জন্য রেশন, আবাসন কর্ম অবসানে পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিক ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত হলে সমাজের বৈষম্য দূর হবে না, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা না থাকলে দেশেও সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চা হবে না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক ন্যয়বিচারের কথা আর ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানে উচ্চারিত হয়েছিল বৈষম্য দূর করার দাবি। এই দুই আন্দোলনেই অকাতরে জীবন দিয়েছে শ্রমিক। কিন্তু তাদের স্বপ্ন এখনও অধরা। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটে রক্ত দিয়ে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল শ্রমিকেরা, ১৯১৭ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সেখানে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। এরপর আইএলও প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯১৯ সালে। আইএলওর প্রথম কনভেনশনে ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবসের ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখনও বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকেরা কর্ম ঘণ্টার সাথে সাথে কাজ পাওয়ার অধিকারের জন্য লড়ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের আইনি স্বীকৃতি আছে কিন্তু এখনও বাংলাদেশের শ্রমিকদের কাজ, কর্মঘণ্টা, ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আর মর্যাদার জন্য লড়তে হচ্ছে। পুঁজিপতিদের পুঁজির বিশ্বায়ন হয়েছে কিন্তু শ্রমিকের অধিকারের বিশ্বায়ন হয়নি। দেশে এবং প্রবাসে তার শ্রম অধিকারহীনতা ও মজুরি বৈষম্যের শিকার। মে দিবস শিখিয়েছে শোষণ বঞ্চনা মেনে নেয়া নয়, বরং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে অধিকার। এই লড়াইয়ে প্রয়োজন শিক্ষা, সংগঠন এবং শৃঙ্খলা। মে দিবস মনে করিয়ে দেয় অতীতের লড়াইয়ের কথা। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে দুঃসহ বর্তমান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পাব ভবিষ্যৎ সংগ্রামের দিশা। মে দিবসে তাই আহবান– কাজের অধিকার ও স্বীকৃতি এবং কর্ম ঘণ্টা নির্ধারণ করার পাশাপাশি ন্যায্য মজুরিটাও নিশ্চিত করতে হবে। শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই কেবল শ্রমিকের জীবন নিরাপদ হবে আর সমাজ হয়ে উঠবে মানবিক ও গণতান্ত্রিক। পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ উন্মোচন আর শ্রমিকদেরকে সচেতন করে তুলে শোষণহীন সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম শক্তিশালী করতে মে দিবস বারবার আসে প্রেরণার উৎস হয়ে।

মে দিবসের কর্মসূচি পালিত

মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক সংগ্রাম কমিটি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, মাগুরাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মে দিবস পালিত হয়।

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দাবি

১৫ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, সমাবেশটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির নির্বাহী সদস্য লাকী আক্তার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হাওরে অকাল বন্যা, কৃষকের ফসলসহ সামগ্রিক ক্ষতি প্রাকৃতি বিপর্যয় ও মানুষের সৃষ্টি বিপর্যয়ের কারণে হয়ে থাকে। আর এসমস্যা অনিরসনীয় নয়। কিন্তু কেন বার বার এ পরিস্থিতিতে হাওর বাসিকে পড়তে হয়। এর জন্য দায়ী সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের পথে না হাটা ও শাসকশ্রেণির মুনাফাকেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। নেতৃবৃন্দ হাওর অঞ্চলের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, পানি ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ মওকুফ এবং নতুন করে সহজ শর্তে সুদমুক্ত বা স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা আবার উৎপাদনে ফিরে আসতে পারে। হাওর অঞ্চলে টেকসইভাবে নদী, ও খালগুলো খনন করতে হবে। কার্যকর বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সচল রাখা, এসব কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানান।

সমাবেশ থেকে আগামী ৭ মে হাওরের বন্যাকবলিত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রানা প্লাজার ১৩ বছর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষ

নবম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা অকার্যকর, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ নেই।

শুধু বড় দুর্ঘটনাই নয়; প্রতিদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় নিভে যাচ্ছে অজস্র শ্রমিকের জীবন। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট, বিস্ফোরিত বয়লার, ধসে পড়া পুরোনো কারখানার দেয়াল–এসব 'ছোট ঘটনা' গণমাধ্যমের শিরোনাম হয় না। কিন্তু এর পেছনে থাকে এক একটি পরিবারের অর্থনৈতিক চরম বিপর্যয়। দাফনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হতে হয় শ্রমিকের স্ত্রী-সন্তান, পরিবারকে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ ও প্রণোদনা নেই, নেই পুনর্বাসনের বাস্তব পরিকল্পনা। অথচ বিদেশি ক্রেতারা দর কষাকষি করে কম দামে পণ্য কিনে নেয়, মালিক মুনাফা পাচার করে, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, আর শ্রমিক পড়ে থাকে চরম দারিদ্র্য ও আইনের ফাঁকে। দীর্ঘ ১৩ বছরে রানা প্লাজার ঘটনায় এখনও ভবন মালিক বা কারখানা মালিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে ধুলো পাহাড় জমছে মন্ত্রণালয়ের ফাইলবাক্সে। এই দায়মুক্তির সংস্কৃতিই পরবর্তী দুর্ঘটনার বীজ রোপণ করে।

এ ঘটনায় কেউ শাস্তি পায়নি? বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সরব হয় না ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোনো কাঠামো আইন তৈরি করতে। বরং, মালিকদের রক্ষায় আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করা হয়। দুর্ঘটনার পর মালিকপক্ষ এককালীন সামান্য অনুদান দিয়ে দায় এড়িয়ে চলে। আমরা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে আসছি শ্রমিকের মৃত্যুতে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অথচ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ ধারায় মৃত্যুতে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান আজও অপরিবর্তিত–এটি শ্রমিক পরিবারের প্রতি রাষ্ট্রের উপহাস ছাড়া কিছু নয়।

কেন দরকার সার্বজনীন ইমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম?

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক চাপে পোশাকশিল্পে পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'ইমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম' (ইআইএস) চালু হয়। বর্তমানে তা রপ্তানিমুখী শিল্পে কিছু মাত্রায় কার্যকর। কিন্তু নির্মাণ, পরিবহন, রি-রোলিং মিল, কেমিক্যাল, জাহাজভাঙা শিল্প–যেখানে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ—সেখানে বিমার আওতা নেই। প্রায় ৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমজীবী মানুষের বড় অংশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

একজন কর্মক্ষম মানুষের মৃত্যু মানে পুরো পরিবার পথে বসে যাওয়া। পঙ্গুত্ব মানে আজীবন ভোগান্তি, সামাজিক অমর্যাদাপূর্ণ জীবন। এই বাস্তবতায় 'অনুদান' নয়, দরকার আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ। আর সেটা সম্ভব শুধু সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক পেশাগত দুর্ঘটনা বীমার মাধ্যমে।

২৪ এপ্রিল : গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস হিসাবে ঘোষণার দাবি

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট ২০১৪ সাল থেকে দাবি জানিয়ে আসছে–২৪ এপ্রিলকে গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস হিসাবে সরকারিভাবে ঘোষণা করতে হবে। আজ সেই দাবি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ রানা প্লাজার ১৩ বছর পরও ভবন মালিক ও কারখানা মালিকদের কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়নি। তদন্ত শেষ হয়নি, বিচার হয়নি, সম্পত্তি ক্রোক বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এটি শ্রমিকের প্রতি চরম অবহেলা ও বৈরী আচরণ।

তাই আওয়াজ তুলুন–

ক. রানা প্লাজাসহ ও অন্যান্য শিল্প দুর্ঘটনায় মালিক, ভবন মালিক ও দায়িত্বে অবহেলাকারী সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

খ. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু হলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ আইনত বাধ্যতামূলক করতে হবে

গ. কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

ঘ. মানসম্পন্ন জীবনযাপনের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

ঙ. দুর্ঘটনায় আহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের জন্য আজীবন চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আইন বাধ্যবাধকতামূলক করতে হবে

চ. মালিকের অবহেলায় দুর্ঘটনা প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি–কারাদণ্ড ও কারখানা বন্ধের বিধান করতে হবে

ছ. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক–সব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দুর্ঘটনা বিমা (ইআইআইএস) বাধ্যতামূলক করতে হবে।

রানা প্লাজা দিবস পালিত

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে রানা প্লাজা শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল জুরাইন কবরস্থানে রানা প্লাজার নিহত ও পরিচয়হীন শ্রমিকদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সমাবেশ এর আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিকনেতা খালেকুজ্জামান লিপন, আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদসহ নেতৃবৃন্দ। জুরাইন কবরস্থানে আরও পুষ্পমাল্য অর্পণ করে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট ও রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম কমিটি। এসময়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট গাজীপুর জেলা শাখার ইদ্যোগে চান্দনা চৌরাস্তায় ও সাভার রানা প্লাজা বেদিমূলে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সমাবেশ, বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করুন

অবিলম্বে বাণিজ্যচুক্তি সংসদে এজেন্ডা করে আলোচনা করুন

১১ এপ্রিল ১৩টি বামপন্থি, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট-এর আহবানে সারা দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, বাসদ (মাহবুব) কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটন, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক কমরেড রজত হুদা, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শহীদুল ইসলাম,বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি কমরেড আব্দুল আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন যুক্ত রাষ্টের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ফলে আমাদের অপ্রয়োজনী জিনিস ক্রয় করতে হবে। যা আমাদের কৃষি ও কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যা কোনোভাবেই দেশের জন্য কল্যাণকর নয় বরং স্বার্থ বিরোধী।

এ চুক্তি কার্যকর হলে বাংলাদেশ যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে

১. বাংলাদেশকে আগামী ১৫ বছর আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের এলএনজি আমদানি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

২. টনপ্রতি ৭৫-৮০ ডলার বেশি দামে আগামী পাঁচ বছর প্রতিবছর ৭ লাখ টন করে গম ক্রয় করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দামে ২৬ লাখ টন সয়াবিন ও সয়াবিনজাত পণ্য কিনতে হবে, যার মূল্য দাঁড়াবে ১২৫ কোটি ডলার।

৪. তুলা, ফলমূল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য কেনার জন্য বাংলাদেশকে ব্যয় করতে হবে ৩৫০ কোটি ডলার বা ৪২ হাজার কোটি টাকা।

৫. মার্কিন বেসামরিক কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিনা দরপত্রে ৩৫ হাজার কোটি টাকায় ১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে হবে। সামরিক সরঞ্জাম কেনা বাড়াতে হবে।

৬. বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্ক-ছাড় সুবিধা পাবে, বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ সুবিধা পাবে মাত্র ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে। এর মধ্যে অধিকাংশ পণ্য রফতানির সুযোগ ও সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই।

৭. চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মার্কিন বাণিজ্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এরূপ কোনো দেশের সাথে অর্থাৎ চীন, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সাথে বাংলাদেশ কোনো বাণিজ্যচুক্তি করতে পারবে না। এই শর্ত দ্বারা সরাসরি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন, রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি চাইতে হচ্ছে।

৮. এই চুক্তিতে মাছ, মাংসসহ সব পণ্যের অবাধ আমদানির বাধ্যবাধকতা থাকায় দেশের কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করে পোলট্রি, মৎস্য, দুগ্ধসহ বিভিন্ন খাতে আমাদের দেশে বর্তমানে যেটুকু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ধস নামবে। অপ্রয়োজনে কৃষিপণ্য কিনতে আমরা বাধ্য হব। রাসায়নিক পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ঢোকার সুযোগ অবারিত হবে।

৯. এই চুক্তির ফলে আমরা বেশি দামে মার্কিন তুলা কিনতে বাধ্য হব। পরিবহনে ট্রান্সশিপমেন্ট সময় বেশি লাগবে। তৈরি পোশাকের খরচ বেড়ে যাবে। রপ্তানি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়বে। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পে ধস নামবে, অনেক শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হবে।

১০. এই চুক্তি কার্যকর হলে আগামী ১০ বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা ৬,৪১০টি পণ্যের মধ্যে ৬,০৩৮টি পণ্যের শুল্ক মওকুফ হয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশ ১,৩২৭ কোটি টাকার আমদানি শুল্ক হারাবে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর যুক্তরাষ্ট্র এখন গড়ে ১৫% হারে যে শুল্ক নেয়, এ চুক্তির পর তার সাথে আরও ১৯% যোগ করে মোট ৩৪% হারে শুল্ক নেবে।

১১. বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৬ বিলিয়ন ডলার। জাপানের সাথে ঘাটতি ০.৪৫ বিলিয়ন ডলার এব ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ১৯ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক সুবিধা পাওয়া ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হলে জাপান, ইউরোপী ইউনিয়নসহ অন্যরাও অনুরূপভাবে শুল্ক সুবিধা দাবি করলে আমাদের অর্থনীতি এক মহাসংকটে পতিত হবে। ইতিমধ্যে জাপান আলোচনা তুলেছে।

১২. এসবের বাইরে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল আরও চুক্তির আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের জন্য নীতিমালা, নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়। প্রথমদিকে নির্মাণজনিত দুর্বলতা থাকলেও ইতিমধ্যে তা অনেকাংশই দূর হয়েছে। ফলে দ্রুত এই বাহন যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তেমনি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। এই বাহন ব্যবহার সহজ, সস্তা এবং শহরের ছোট রাস্তা, ও অলিগলিতে চলতে পারে বলে স্বল্প আয়ের মানুষের দৈনন্দিন কাজে এক অপরিহার্য বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে প্রায় ৫০ লাখ চালক ও ১০ লাখ মালিক, গ্যারেজ মালিক, চার্জিং ব্যবসায়ী, মেকানিকসহ ৬০ লাখ পরিবার এইসব ব্যাটারিচালিত থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এরসাথে যানবাহন তৈরি-মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ নির্মাণ-বিক্রি, ব্যাটারি উৎপাদন ও বিপণনসহ নানা ধরনের কাজে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও ৬০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় একটি সমন্বিত নীতিমালার দাবি দেশবাসির দীর্ঘদিনের। এটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমশক্তি যারা সরকারের কোন ধরনের নীতি সহায়তা ছাড়া আত্মকর্মসংস্থান এর মাধ্যমে এ সেক্টরে সরাসরি যুক্ত।

এদের আয়ের উপর নির্ভরশীল দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ। ৬০ লাখ মানুষের আয়, ব্যবসা ও উৎপাদন ঘিরে এ সেক্টর প্রতি বছর দেশের জিডিপিতে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা অবদান রাখছে। কিন্তু তাদের অবদানের আইনগত স্বীকৃতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে কোন মোটরযান বা যান্ত্রিকযান এর নিবন্ধন বা লাইসেন্স দেওয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হচ্ছে BRTA. কিন্তু কোন সক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন না থাকা সত্বেও সিটি কর্পোরেশনকে এই দায়িত্ব দেয়ার আয়োজন করেছিল অন্তর্বর্তিকালীন সরকার। সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার আইনে ব্যাটারিচালিত যানবাহন বা এই ধরনের গাড়ির নিবন্ধন ও লাইসেন্স দেওয়ার অনুমতি নেই।

BRTA ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে একটি নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ইতিপূর্বে ২০১৯, '২২ ও '২৪ সালে ২টি খসড়া নীতিমালা প্রকাশিত করেছিল। এর মধ্যে একটি নীতিমালা কার্যকর হয়েছে, আর একটি অপেক্ষায় আছে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি করে সেগুলি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছিলাম। সর্বশেষ '২৫ সালে আবার নতুন করে 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫' প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমরা জানতে পেরে এই নীতিমালার উপর সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গত ২০ আগস্ট '২৫ অনেকগুলি সংশোধনী, সংযোজনী ও সুপারিশ BRTA চেয়ারম্যান বরাবর পেশ করেছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে গত ২৮ আগস্ট '২৫ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত '২৫ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০09 (এর ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে কোন রকম কাঠামোগত প্রস্তুতি, সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে কোন সমন্বয় ছাড়া, দুটি খসড়া নীতিমালা থাকার পরেও এবং কোন অংশীজনদের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন, নীতিমালা নির্ধারণসহ এ বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা সিটি কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। কেন এবং কার স্বার্থে এসব করা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান হওয়াও জরুরি বলে আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা কোন বিশেষ ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর কাছে ৬০ লাখ মানুষকে জিম্মি এবং দেশীয় স্থানীয় অটোমোবাইল খাতকে বাতিল করে দেওয়ার কোন বিষয় থাকতে পারে।

তীব্র বেকারত্বের এই দেশে কর্ম সংস্থানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং যানজট নিরসন এবং সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ও ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স-প্রশিক্ষণ-রুট পারমিট, স্বল্প গতির ও লোকাল যানবানের জন্য পৃথক লেন/সার্ভিস রোড নির্মাণ করার কোন বিকল্প নেই। সংগ্রাম পরিষদ বিগত ১৩ বছর ধরে ধারাবাহিক যানজট নিরসন ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। ফলে সরকারের ভূমিকা লাখ লাখ মানুষের জীবনে স্বস্তি নিয়ে আসবে। আমাদের প্রত্যাশা সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় আধুনিকায়ন করে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের একটি অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত করাসহ ৯ দফা বাস্তবায়নে আপনার নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

মাহবুবা ইয়াসমিন রীতার মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৪ এপ্রিল '২৬ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বগুড়া জেলা আহ্বায়ক কমরেড সাইফুল ইসলাম পল্টুর পত্নী বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষিকা এবং দলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক মাহবুবা ইয়াসমিন রীতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাসদ পরিবার এক অকৃত্রিম বন্ধু ও শ্রমজীবী মানুষ তাদের একজন সুহৃৎ ও দরদিকে হারিয়েছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, মাহবুবা ইয়াসমিন রীতা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে স্বৈরশাসক এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী, হিসেবে রাজপথে লড়াকু ভূমিকা রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন যাবত দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে ভোগছিলেন। ২৩ এপ্রিল রাতে তিনি বগুড়া টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে তিনি ঢাকা ও ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ এবং বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, নাটোর জেলা শাখার পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে পুষ্পমাল্য প্রদান করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কমরেড আবদুর রহিমের মৃত্যুতে শোক

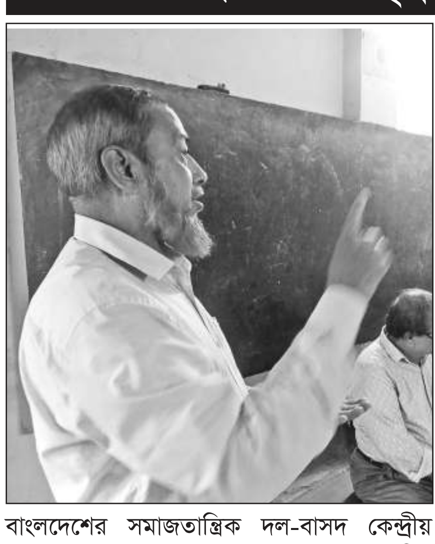

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৪ এপ্রিল '২৬ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ কক্সবাজার জেলা শাখার সদস্য সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম কামিল মাদ্রাসার সাবেক প্রফেসর কমরেড আবদুর রহিম এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়পরিজনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভোগছিলেন। ২৪ এপ্রিল সকাল ১১ টায় তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড আবদুর রহিমের মৃত্যুতে পার্টি সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল একজন নিবেদিত প্রাণ সমর্থক দরদিকে হারালো।

কমরেড আবদুর রহিম লাল সালাম।

হাওরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত কর

মৌলভীবাজার

হাওরে অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ, বন্যার সমস্যার স্থায়ী সমাধান, কৃষকদের ঋণ মওকুফ, বাঁধ নির্মাণ, হাওর উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে ২

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান ভুলুর মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৪ ফেব্রুয়ারি '২৬ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড ফজলুর রহমান ভুলুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে মাঈন উদ্দিন চৌধুরী, শাহজাহান কবীর ও ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ নর্থ সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পামাল্য অর্পণ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান ভুলু দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিস ও কিডনির রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শেষ পর্যায়ে পিজি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য, কমরেড ভুলু স্বাধীনতা-পূর্বকালে ছাত্রলীগ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বাসদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সক্রিয়ভাবে দলের সাথে যুক্ত না থাকলেও আমৃত্যু বাসদের একজন সক্রিয় অন্তপ্রাণ সমর্থক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড ভুলুর মৃত্যুতে পার্টি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল একজন নিবেদিত প্রাণ সমর্থক দরদিকে হারালো।

কমরেড ফজলুর রহমান ভুলু লাল সালাম।

জন-জাতীয়স্বার্থ বিরোধীরাই জাতীয় সংসদে বসে আছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হস্তান্তর আরও সীমাছাড়া করা হয়েছে। পরস্পর অবিশ্বাসী প্রধান দুই বুর্জোয়া দলের মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, ২ দফা সামরিক শাসন ও ১ দফা পরোক্ষ সামরিক কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা, নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠানো, ১৫/১৬ বছরের জগদ্দলীয় পাথুরে স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী শাসন গণ অভ্যুত্থানে উচ্ছেদ হওয়া পরবর্তী অন্তর্বর্তী মব শাসন, জনগণের প্রাণঢালা শক্তির অংশগ্রহণকে নানা কারসাজিতে দখলে নেওয়া, সাম্রাজ্যবাদী ও বৃহৎ শক্তিসমূহের সাথে জাতীয় স্বার্থের বদলে শ্রেণি ও গোষ্ঠী স্বার্থের সমঝোতা ও দ্বন্দ্ব-মিলন সম্পর্কের নানা হিসাবনিকাশের আয়োজনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীর স্থলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বনাম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী সমীকরণে ক্ষমতা বিন্যস্ত করা হয়েছে। জন-জাতীয় স্বার্থ বিরোধীরাই আজ জাতীয় সংসদে বসে আছে। আন্দোলনকারী যুবসমাজকে গণবিচ্ছিন্ন বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত করার সকল রাস্তা খুলে দেওয়া হলো।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে ৫ ভাগ শোষক লুটেরাদের হাতে অভাবনীয় সম্পদ পুঞ্জীভূত করছে আর ৯৫ ভাগ শোষিত মানুষকে অসহনীয় দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ফেলছে। তাই যন্ত্রণাকাতর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভক্তিরেখা অসংখ্য করার কাজে টাকা ঢালছে। তাদের ভাবশিষ্য বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে বুদ্ধি বিভ্রান্তির বহু দরজা খোলাচ্ছে দিনকে দিন। সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়াসমূহ চিন্তার জটাজাল ছড়াচ্ছে। মাদকের বাণিজ্য ও ব্যবহার বাড়ছে। আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার, নারীবিদ্বেষ ইত্যাদি যা কিছু একদিন বুর্জোয়াশ্রেণি তাদের উত্থানেরকালে বর্জন করেছিল, এখন সব ফিরিয়ে আনছে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি মান্ধাতার আমলের এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হাতে তৈরি ইত্যাদি কথা লিখে এবং বলে তাদের মনগড়া সাম্প্রদায়িকতার রসসিক্ত উন্মাদনায় ভরা নতুন বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে। পুরানো অতীতকে অস্বীকার করে নয়, অতীতের সারবত্তাকে সমৃদ্ধ বর্তমানে ও ভবিষ্যতের সাধনা সৌন্দর্যে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন যা চলছে তাতে অতীতের অর্জন বিসর্জন দিয়ে বর্তমানে দৈন্যদশা চেহারাটাই ফুটে উঠছে। কথাবার্তায় সৌজন্য-শালীনতা, মনোভঙ্গি বা বাসনার সুন্দর প্রকাশের বদলে স্থূলতা, অমার্জিত ভাবভঙ্গির প্রকাশ ঘটছে। নতুন কিছু বলতে বা প্রকাশ করতে পারলেই তা উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে ঠাঁই পায় না, তা সমৃদ্ধ অতীতের সংযোগে ও সাধনায় পরিপুষ্ট হতে হয়। বিপ্লবী বলিষ্ঠতা আর উশৃঙ্খল ঔদ্ধত্য এক পরিমাপে গ্রহণীয় বা শ্রদ্ধেয় হয় না। সমাজতন্ত্রের বা সাম্যের বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদী ধারণাকে কতভাবে বিভ্রান্ত ও কালিমালিপ্ত করা যায় তার অব্যাহত প্রচেষ্টা দুই শত বছর ধরে বিশ্বব্যাপী চলে আসছে। বাংলাদেশে বুর্জোয়াশক্তি, ধর্মীয় মৌলবাদীগোষ্ঠী এবং এক দল প্রগতিশীলতার ভেকধারীরাও সমাতন্ত্র, মার্কসবাদকে অকার্যকর বলে তথাকথিত উনক্লুসিভের নামে প্রবণতা তৈরি করে প্রকারন্তরে মৌলবাদী শক্তিকে বিকাশের রাস্তা করে দিচ্ছে। এখন তার উন্মত্ততা অনেক বাড়ানো হচ্ছে। বামপন্থি আন্দোলনের অপরিণত শক্তিকে যতটা এতে প্রভাবিত করা যাচ্ছে, বাম বিপ্লবী আন্দোলন ততটা দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে বুর্জোয়াশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই লাভবান হচ্ছে। পোশাকি পরিবর্তনে অন্তর্গত স্বভাবচরিত্রের বদল ঘটে না। শিক্ষার মান নামছে। ৩ ধারার শিক্ষা বহু উপধারা যোগে সামাজিক মননসত্তাকে এমনভাবে খণ্ডিত ও বিভক্ত করে তুলেছে যে এর কোনোটার মাঝেই আর দেশপ্রেম, মানবমিলনবোধ, দশের স্বার্থে একের স্বার্থত্যাগ, উচ্চতর মানবিক সাংস্কৃতিক বোধ দাঁড়াতে পারছে না। উচ্চ ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়ছে সাথে সাথে উচ্চ মানের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধস নামছে। অসহিষ্ণুতা-অস্থিরতা, বেপরোয়া উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়স্কদের জীবনে অসহায়ত্ব, নিরাপত্তাহীনতা ও একাকীত্ব বাড়ছে। পারিবারিক, সামাজিক দায়িত্ববোধ লোপ পাচ্ছে। অল্প কিছু লোককে কার্ড প্রদান ও লোকদেখানো কিছু ভর্তুকি ব্যবস্থা সে স্থান পূরণ করবে কীভাবে?

এখন সমাজ বদলের ভাবনা ও তা বাস্তবায়নের শক্তির পাশে দাঁড়াতে হবে। বাম বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিকে অধিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। ঝরে যাওয়া শক্তির চেয়েও গড়ে তোলার শক্তির প্রতি বেশি মনযোগী হতে হবে। ভ্রান্ত চিন্তার সকল মতপথের বিপরীতে সঠিক রাস্তা দেখাতে হবে। মাছ যেমন পানিতে থাকে তেমন করে থেকে জনগণের কাছ থেকে শেখা ও আবার জনগণের মাঝে দিক দিশামূলক ভূমিকা নিয়ে যাওয়ার ওপর থেকে নিচ প্রক্রিয়া সচল করতে হবে।

শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজবদল আকাঙ্ক্ষীদেরকে গভীর অধ্যয়ন অনুশীলন ও গণসংযোগ, গণসংগ্রামে নিরলস নিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ প্রচেষ্টাই জনগণের মধ্যে হতাশা দূর করবে। নতুন আশা জাগিয়ে তুলবে। মেকি বুদ্ধিজীবী ও যখন যেমন তখন তেমন কথিত জনদরদী ও স্বার্থান্বেষীদের স্বরূপ আরও উন্মোচিত করা যাবে। ইতোমধ্যে এদের প্রকাশ্য এবং লুকানো অনেকের চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। সঠিক বিপ্লবী চিন্তা ও সংগ্রাম যতো এগুবে ততো বিভ্রান্তির ঘোর কাটতে থাকবে। আর কতো? এবারের শপথ হোক আগামীর ভবিষ্যত বামপন্থার, সমাজতন্ত্রের, মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা সাম্য সমাজ বাস্তবায়নের। জনগণের সকল উত্থান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতির। সারা বিশ্ব নতুন জাগরণের অপেক্ষায়। আমরা বামপন্থিরা যেন পিছিয়ে না পড়ে সামনে দাঁড়াতে পারি। সেজন্য আর পুঁজিবাদী শোষকদের সেবা নয়, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথ রচনা করতে হবে। সেটাই হোক আগামীর বাংলাদেশ।

আগামী জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ ভাগ বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

১৭ মে সারাদেশে ডিসি/ইউএনও এর মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি ঘোষণা

১৭ মে '২৬ সারাদেশে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দ করা; খেতমজুরদের জন্য সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান, আর্মি রেটে রেশন সরবরাহ, এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক বাজারমূল্য নিশ্চিতকরণের দাবিতে সারাদেশে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং উল্লিখিত দাবিগুলো সংবলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর পেশের কর্মসূচি সফল করা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি দেশের অর্থনীতিতে এখনও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ খাত। মোট শ্রমশক্তির ৪৪ ভাগ কৃষিতে যুক্ত। রাষ্ট্র ও সরকারের চরম অবহেলার পরেও একক খাত হিসেবে কৃষি জিডিপিতে ১১ শতাংশ অবদান রাখছে। দেশের রপ্তানি খাতে কৃষি পণ্যের ভূমিকা ৭%। কৃষিতে ১% প্রবৃদ্ধি ঘটলে ৩% বেকারত্ব কমে। কৃষি-মৎস্য, প্রাণিজ ও খাদ্য মন্ত্রণালয় মিলে বাজেটে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ৫%। শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মাত্র ৩.২১%। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে কৃষি ঋণ মোট ঋণ বিতরণের মাত্র ৩.৩৬%। বীজ-সার নিয়ে দুর্নীতি, ভেজাল সার, নিম্ন মানের বীজ, কীটনাশকের ভেজালের বিরুদ্ধে সরকারের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নাই। বীজ-সার, কীটনাশক-সেচসহ কৃষি উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সরকারি ক্রয়কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় সরকারি হিমাগার-সাইলো ও সংরক্ষণাগার না থাকায় কৃষক মৌসুমে ফসল ওঠার পরই কমদামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, কালোবাজারি, ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যে লাভজনক দাম না পেয়ে কৃষক সর্বশান্ত হচ্ছে। আবার ভোক্তাদেরও চড়া মূল্যে কিনে খেতে হয়। চলতি বোরো মৌসুমে ডিজেল ও সার সংকটে কৃষক দিশেহারা, অপর দিকে সরকারি রক্ষাণাগার না থাকায় ধান-আলু, পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি এবং পচনশীল শস্য ও সবজি উৎপাদন করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চড়াসুদে এনজিও-মহাজনি ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পেরে কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এ চক্রে মাঝারি কৃষক ক্ষুদ্রকৃষকে, ক্ষুদ্রকৃষক প্রান্তিক কৃষকে এবং প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। এভাবে বছরে অন্তত ১১ লাখ কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হয়। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খেতমজুরদের ৩ মাসের বেশি কাজ না থাকা, শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় দরিদ্র-নিম্নবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের বাইরে যাওয়ায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করছে। সামাজিক সুরক্ষাখাতে অপ্রতুল সরকারি বরাদ্দ, অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণে প্রকৃত হকদাররা পায় না। এমতাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে নিম্নোক্তো দাবিসমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সারা দেশের সকল কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১. আসন্ন জাতীয় বাজেটে (২০২৬-২৭) উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দ করতে হবে

২. বিএডিসিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সচল করে সার-বীজ, কীটনাশক, সেচসহ সকল কৃষি উপকরণ ভর্তুকি মূল্যে খোদ কৃষকদের সরবরাহ করতে হবে। গবাদিপশু-মাছ, মুরগির ফিডের দাম কমাতে হবে

৩. ১০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ সুদাসলে মওকুফের সরকারি ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে। এনজিও এবং মহাজনি ঋণের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪ প্রতি ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে খোদ কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদন খরচের সাথে ৪০ ভাগ মুনাফা যুক্ত করে ফসলাদি ক্রয় করতে হবে

৫. সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত হিমাগার-সাইলো নির্মাণ, উদ্বৃত্ত শস্য লাভজনক দামে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশে রপ্তানিসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হবে

৬. খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, গ্রাম-শহরের শ্রমজীবীদের জন্য আর্মি রেটে রেশন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুর্নীতি, দলীয়করণ মুক্তভাবে কৃষিকার্ড ও ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য নিরসন করতে হবে

৭. সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে সমবায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে

৮. আমেরিকার স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল, আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও উদ্ধার করে শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করতে হবে

৯, তিস্তাসহ অভিন্ন ৫৪টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

শ্রম অধ্যাদেশ সংসদের চলতি অধিবেশনেই অনুমোদনের আহ্বান

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সংকোচনকারী প্রস্তাবনাসমূহ সংশোধন করে এবং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা সম্প্রসারিত করে যে সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা অব্যাহত রেখে কোনো বিলম্ব ছাড়াই উক্ত অধ্যাদেশটির পরিবর্তিত বিল জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনেই গৃহীত হবে। আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি শ্রমিকবান্ধব, ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা জরুরি।

আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানতে পেরেছি যে, সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার তালিকায় শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে ২২টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতে এই মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান সংগঠন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি। স্কপ এখনো জানেনা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের কল্যাণে কী কাজ করাছে যা প্রতিনিধিত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।

মাননীয় মন্ত্রী, কেরানীগঞ্জে গ্যাসলাইটার কারখানায় দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুদান দেয়ার ঘোষণার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়ীদের শাস্তি এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি

গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে বাতিল, চুক্তি সম্পাদনের সাথে যুক্তদের বিচার, নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা বন্ধ করার দাবিতে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের উদ্যোগে ৬ এপ্রিল '২৬ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকারের আমলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পাদিত বৈষম্যমূলক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী 'রিসিপ্রোকাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (RTA) বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে এবং এই চুক্তির মূল হোতা ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের অবিলম্বে অপসারণ দাবি জানানো হয়েছে। সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, একটি সত্যিকারের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি দুটি পক্ষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারি '২৬ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নির্বাচনের ৩ দিন আগে অতি গোপনে তড়িঘড়ি করে সম্পাদিত ৩২ পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে Bangladesh shall (বাংলাদেশ হবে) বাক্যাংশটি ১৫৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে, আর United States shall মাত্র ৯ বার। এটিই প্রমাণ করে এই চুক্তি বৈষম্যমূলক ও মার্কিন স্বার্থে তৈরি।

তিনি বলেন, এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে মার্কিন ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্ক ছাড় দিতে হবে, বাংলাদেশ শুল্ক সুবিধা পাবে মাত্র ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে। CPD-বলেছে এর ফলে বাংলাদেশ বার্ষিক ১ হাজার ৩২৭ কোটি টাকার আমদানি-শুল্ক রাজস্ব হারাবে। বিনিময়ে বাংলাদেশকে যে 'সুবিধা' দেওয়া হয়েছে তা নেহাতই নামমাত্র–মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের উপর রেসিপ্রোকাল শুল্ক ৩৭% থেকে কমিয়ে মাত্র ১৯% করা হয়েছে, এবং বিদ্যমান ১৫.৫% শুল্ক মিলিয়ে মোট কার্যকর শুল্কের বোঝা দাঁড়ায় ৩৪.৫%-এ। এই চুক্তি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সস্তায় পণ্য কেনার স্বাধীনতা হরণ করে মার্কিন পণ্য বেশি দামে কিনতে বাধ্য করবে। গম-তুলা, রাসায়নিক ও শিল্প পণ্য, এলএনজি, প্রতিরক্ষা সামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী মার্কিনীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হবে।

তিনি বলেন, মার্কিন বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর প্রাথমিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার–বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এই চুক্তির অর্থ বাংলাদেশকে ১০ থেকে ২০ বছর ধরে প্রতি বছর ১,৫০০ থেকে ২,০০০ কোটি টাকা কিস্তি দিতে হবে—যা জনগণের উপর অন্যায় আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেবে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে সব কিছু ঠিক থাকলেও ১৪টির মধ্যে প্রথম বিমানটিও আসবে ২০৩১ সালের অক্টোবরের পর। উন্মুক্ত দরপত্র ছাড়া এভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় চুক্তি করা আইনের সরাসরি লঙ্ঘন।

তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি শুধু বাণিজ্যিক নয়, এটি একটি কৌশলগত অধীনতার দলিল। চুক্তির ৪.১ ধারায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কোনো দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক আরোপ করে, তাহলে বাংলাদেশকে 'পরিপূরক বিধিনিষেধ' গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হলো, আমেরিকা চীন বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশকেও তাতে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে—যা বাংলাদেশের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সরাসরি লঙ্ঘন। এছাড়া চুক্তির ৫.২ ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এমন কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবে না যা মার্কিন স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। ৪.৩(৪) ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ যদি চীন বা রাশিয়ার সাথে কোনো মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করে যা এই চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি বাতিল করে পুনরায় দণ্ডমূলক শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এর মানে হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এখন ওয়াশিংটনের ভেটো-ক্ষমতার অধীনে চলে যাবে।

তিনি বলেন, এই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী দাসত্বের চুক্তির নেপথ্যে ছিলেন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। চুক্তি সম্পাদনে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে সক্রিয় ও তৎপর। এই একই ব্যক্তিকে বিএনপি সরকার তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে—এটি জনগণের সাথে এক নির্লজ্জ প্রতারণা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর খলিলুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন—'এটি খুব ভালো চুক্তি' এবং 'দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চুক্তি হয়নি।' তিনি আরও দাবি করেছেন যে, নির্বাচনের আগে বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতি দিয়ে এই চুক্তি করা হয়েছে—অর্থাৎ বিএনপি ও জামায়াত এই দেশবিক্রির বিষয়ে 'সম্মতি' দিয়েছিল। তাই বিএনপি সরকারকে অবিলম্বে এই চুক্তি বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

সিপিবির সভাপতি কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন বলেন, বিএনপি-জামাতের শীর্ষ নেতাদের সাথে মার্কিন প্রতিনিধির 'কথা বলা' মানে জনগণের সম্মতি নয়। সাংবিধানিক নীতি অনুযায়ী, দেশের সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত যেকোনো চুক্তি সংসদে অনুমোদিত হতে হয়—এই চুক্তি করার আগে তা হয়নি।

তিনি বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি '২৬ তারিখে মার্কিন ফেডারেল কোর্ট ৬-৩ ভোটে ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করেছে—ট্রাম্প প্রশাসন 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট (IEEPA)'-এর আওতায় যে ব্যাপক রেসিপ্রোকাল শুল্ক আরোপ করেছিল, তা বেআইনি ও অসাংবিধানিক।

মালয়েশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী দাতুক সেরি জোহারি আবদুল ঘানি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন—সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিন থেকেই মালয়েশিয়া-মার্কিন 'পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি' অকার্যকর হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো—মালয়েশিয়া পারলে বাংলাদেশ কেন পারবে না? ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তি অনুমোদন স্থগিত রেখেছে, ভারত সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিয়েছে—এই বাস্তবতায় বিএনপি সরকার কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করে রাখবে? এটি তাদের কথিত 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে—এই সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বহাল রেখে বিএনপি সরকার যদি মার্কিন মনিবদের সন্তুষ্ট রাখার নীতিতে অটল থাকে, তাহলে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট অপরাপর বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল, সংগঠন ও জনগণকে সাথে নিয়ে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে এই আন্দোলন একটি জাতীয় গণ-প্রতিরোধে পরিণত হবে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। বক্তব্য রাখেন, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন। সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশীদ ভূঁইয়া, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রুকনুজ্জামান রোকন, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুন নুজহাত মনীষা, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুনুর রশীদ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

মার্কিনের সাথে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল কর

অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক সম্পাদিত দাসত্বমূলক অসম ও বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবিতে ৮ এপ্রিল '২৬, জাতীয় প্রেসক্লাব সামনে সমাবেশ শেষে মতিঝিল শাপলা চত্বর পর্যন্ত গানের মিছিল করেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য।

সমাবেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দাসত্বের অসম বাণিজ্যচুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের আহ্বায়ক জামসেদ আনোয়ার তপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, মফিজুর রহমান লাল্টু, ডা. হারুন অর রশীদ, কামাল হোসেন বাদল, রঘু অভিজিৎ রায়, শামসুজ্জামান মিলন, কবি মাসুক শাহী সমাবেশ পরিচালনা করেন বিমল কান্তি দাস।

কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত কর

অকাল বৃষ্টি ও বাজারের চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে লোকসান দিয়ে আলু বিক্রি করে বাধ্য হচ্ছে বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের আলু চাষি কৃষকেরা। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেদের রক্ষার দাবিতে ২৮ মার্চ '২৬ সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের সাতমাথায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেণ সংগঠনের জেলা সভাপতি মাসুদ পারভেজ, বক্তব্য রাখেন বাসদ বগুড়া জেলা সদস্যসচিব অ্যাড. দিলরুবা নূরী, শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি সাইফুজ্জামান টুটুলসহ সদস্য শাহজাহান আলী, নিয়তি সরকার নিতু ও এড. শ্যামল বর্মন।

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত

অতি বৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি পানির ঢলে হাওরসহ দেশের নিম্নাঞ্চলের ধান খেত বন্যার পানিতে তলিতে কৃষকদের বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষিরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছে। এঘটনা প্রায় প্রতিবছর হাওরে ঘটে থাকে।

হাওরে বছরে একবার ফসল হয়। অন্য সময় জমি জলমগ্ন থাকে। এ ধান বিক্রি করে হাওর কেন্দ্রীক কৃষকের সারা বছরের খাবার, ঋণ পরিশোধ, সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সংসার চালানোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু ধান তলিয়ে যাওয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে এখন তারা হতাশ ও অসহায়। সংসার চালানো ঋণ পরিশোধের উপায় হারানোর ভাবনাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, ঋণের কিস্তি মওকুফের দাবি জানান।

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে হাওরের ফসলহানিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, জলাবদ্ধতা ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ২ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক, ক্ষেতমজুর সমিতির কার্যকরী সভাপতি অ্যাড. আনোয়ার হোসেন রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সভাপতি অ্যাড. এ. এস. এম. সবুর, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সহ-সম্পাদক নিখিল দাস এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি অধ্যাপক তরিকুল আলম, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে আরও উপস্থিত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল কর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতন্ত্রমনা মানুষ এর প্রতিবাদ করছে।

যে চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার হরণ করে তা পুরোপুরি ‘অধীনতামূলক’ গোলামি চুক্তি, বাংলাদেশের স্বার্থে এই চুক্তি রুখে দাঁড়ানো আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য।

গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যে বাংলাদেশ শুল্ক পেয়েছিল ১২ শত কোটি টাকা। এই চুক্তি কার্যকর হলে আগামী ১০ বছর আমেরিকা থেকে এদেশে আমদানিকৃত ৬ হাজার ৪১০টি পণ্যের মধ্যে ৬ হাজার ৩৮টি পণ্যের শুল্ক মওকুফ হয়ে যাবে এবং কেবল ৩৭২টি পণ্যের ওপর শুল্ক বাবদ মাত্র ১০ কোটি টাকা আদায় হবে। বাকি ১ হাজার ১৯০ কোটি টাকার শুল্ক বাংলাদেশ হারাবে। অপর দিকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র এখন গড়ে ১৫% হারে যে শুল্ক নেয়, এ চুক্তির পর আরও ১৯% যোগ করে মোট ৩৪% হারে নেবে। এর ফলে ১৫ হাজার কোটির পরিবর্তে ৩৪ হাজার কোটি টাকা শুল্ক দিতে হবে। ফলে, এ চুক্তি আমাদের দেশকে নিঃস্ব করে মার্কিনীদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

বন্ধুগণ,

৩২ পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে ‘Bangladesh Shall’ শব্দটি আছে ১৫৮ বার, ‘USA Shall’ কথাটি লেখা আছে মাত্র ৯ বার। ‘Shall’ শব্দের অর্থ হলো ম্যান্ডেটরি (Mandatory), অর্থাৎ এটি করতে হবে। আর ‘May’ শব্দের অর্থ হলো আপনি করতেও পারেন, আবার অসুবিধা হলে নাও করতে পারেন। এটি বাংলাদেশের জন্য লেখা আছে ৫ বার, কিন্তু USA এর জন্য লেখা আছে ৮ বার। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে চুক্তিটির মধ্যে অসমতা ও অন্যায্যতা আছে। চুক্তিটি U.S.A’-এর স্বার্থে করা হয়েছে।

এই চুক্তিতে মাছ, মাংসসহ সব পণ্যের অবাধ আমদানির বাধ্যবাধকতা থাকায় দেশের কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করে পোলট্রি, মৎস্য, দুগ্ধসহ বিভিন্ন খাতে আমাদের দেশে বর্তমানে যেটুকু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ধস নামবে। অপ্রয়োজনে কৃষিপণ্য কিনতে আমরা বাধ্য হব। রাসায়নিক পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ঢোকার সুযোগ অবারিত হবে। মার্কিন পণ্যে শুল্ক কমাতে বা শুল্কমুক্ত করতে বাধ্য হবার কারণে সরকারের রাজস্ব আয় যেমন কমবে তেমনি বেশি দামে আমদানি করায় ভর্তুকিও বাড়বে। পাশাপাশি, অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য বাংলাদেশের স্বার্থসম্মত হলেও, তা মার্কিন মনোপুত না হলে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থেও ভর্তুকি দেওয়া যাবে না।

প্রতিযোগিতামূলক দামে পাই বলে আমরা চীন থেকে ২০ বিলিয়ন, ভারত থেকে ১০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করি। কিন্তু চুক্তিতে রাষ্ট্রীয় সাবসিডি থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে সেসব দেশ থেকে পণ্য ক্রয় করার নিষেধাজ্ঞা চুক্তিতে রয়েছে। কৃষিপণ্যের মার্কিন উৎপাদনকারীরা সরকারের কাছ থেকে প্রতি বছর যে ১৫ বিলিয়ন ডলারের সাবসিডি পায় তা চুক্তির শর্ত থেকে বাদ রাখা হয়েছে। দেশের ৮০% প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম চীন থেকে আনা হলেও চুক্তির ফলে এবিষয়েও শর্ত আরোপ করায় আমাদেরকে আমেরিকা থেকে ওই সব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে হবে। এর ফলে ব্যাপক ব্যয় ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই অন্যায্য একতরফা ও অসম চুক্তি বাস্তবেই ‘দেশ বিক্রির দলিল ছাড়া কিছুই না’।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বিদায় নেয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন হচ্ছে এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসছে—একথা জেনেও এ ধরনের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার এখতিয়ার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছিল না। পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এই চুক্তি স্বাক্ষর করার বিষয়ে বিএনপি-জামায়াতের সম্মতি ছিল।

এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে অন্তর্বর্তী সরকার এবং চুক্তি এখনও কার্যকর হয়নি। মালয়েশিয়া ইতিমধ্যেই চুক্তি বাতিল করেছে, ভারত স্থগিত করেছে। তাই চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই মালয়েশিয়ার মতো বিএনপি সরকারকে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে। ইতিপূর্বে অন্তর্বর্তী সরকার চট্টগ্রামে লালদিয়ায় নতুন টার্মিনাল নির্মাণ এবং পানগাঁও টার্মিনাল হ্যান্ডলিং এর জন্য বিদেশি সুইডেন ও ডেনমার্কের কোম্পানিকে ইজারা দিয়েছে। লাভজনক নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপি ওয়ার্ল্ড নামক বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা করেছিল। যা এখনও চলমান আছে। অবিলম্বে লালদিয়া ও পানগাঁও ইজারা চুক্তি বাতিল এবং নিউমুরিং টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা বন্ধ করতে হবে। আমেরিকা, ভারতসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে স্বাধীনতাত্তোরকালে সম্পাদিত সকল চুক্তি জনসম্মুক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে। আমেরিকার সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসহ চট্টগ্রাম বন্দর, রামপাল-রূপপুর, আদানি ও টার্মিনাল সংক্রান্ত জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাক্ষরিত সব চুক্তি ও প্রকল্পগুলো বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করতে সর্বাত্মক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল বাম, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, সামাজিক, পেশাজীবী সংগঠন-ব্যক্তি, গোষ্ঠীসহ দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১১টায় সিপিবি কার্যালয়ে দেশের ক্রিয়াশীল বাম-প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল, বন্দর-টার্মিনালসহ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল এবং ইরান, ফিলিস্তিনিসহ দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সাম্রাজ্যবাদী-জায়নবাদী আগ্রাসন, গণহত্যা, লুণ্ঠন ও যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ‘সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোট’ এই ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে বাসদের উদ্বেগ প্রকাশ

মূল্যবৃদ্ধির চাপে জীবনযাত্রার ব্যয় ও দুর্ভোগ বহুগুণ বাড়বে–বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২০ এপ্রিল '২৬ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ১৮ এপ্রিল সরকার সব রকমের জ্বালানি তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৫-২০ টাকা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, এমনিতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে দুর্ভোগ চরমে। এর মধ্যে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অবস্থা সব চেয়ে খারাপ। তার ওপর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পরিবহন, সেচসহ উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে পড়বে। এতে পরিবহন ভাড়া, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে এবং সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আরেক দফা বাড়বে; যা গরিব-মধ্যবিত্তসহ নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যাবে। মূল্যস্ফীতি বাড়বে। এর সাথে এলপিজি গ্যাসের দামও এপ্রিল মাসে ২ দফা বাড়ানোর ফলে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ১৯৪০ টাকা যা গত মাসেও ছিল ১৩০০ টাকা। অনেক সময় গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়াও যায় না। সয়াবিন তেলের মূল্যও লিটার প্রতি ৪টাকা বাড়ানো হয়েছে।

পরিবহনের ভাড়া বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে মালিকরা সরকারকে চাপ দিচ্ছে। (পরবর্তীতে ভাড়া বানানো হয়েছে।) সব মিলিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধি জনগণের উপর ‘মড়ার উপর খাড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, অতীতেও ফ্যাসিবাদী সরকার ২০২২ সালে জ্বালানির দাম এক ধাপে ৩৪ থেকে ৪৬ টাকা বাড়িয়েছিল। এবারেও বর্তমান সরকার সমন্বয়ের নামে লিটার প্রতি ১৫-২০ টাকা দাম বাড়িয়ে জনগণকে দুর্ভোগে ফেললো। জ্বালানি আমদানি ও বিক্রি বাবদ সরকার প্রতি বছর ১৩/14 হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় করে থাকে। এবছরও প্রথম ৮ মাসে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি মুনাফা করেছে বিপিসি।

বিবৃতিতে বলা হয়, পেট্রোল-অকটেন দেশেই অনেকটা উৎপাদন হয় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে। তাহলে পাম্পগুলোতে এতো ভীড় কেন? দাম বাড়ানোর পরও পাম্পে ভীড় কমছে না। মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরকারের হয়তো বাড়তি খরচের চাপ কিছুটা কমবে কিন্তু প্রাপ্যতার সহায়তা হবে না। বিবৃতিতে তিনি মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, বিতরণ বিপণনে অব্যবস্থাপনা দূর করার দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ায় সমন্বয়ের কথা বলে দেশে দাম বাড়ায় অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে সমন্বয় করে দেশের বাজারে দাম কমানো হয় না।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের সেচের বড় অংশ ডিজেল চালিত পাম্পের উপর নির্ভরশীল। এ সময়ে ১ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়; না হলে ধানে চিটা হবে। বোরো ধান থেকে আমাদের মোট চালের ৬০% আসে। ফলে বোরো ধানের ক্ষতি হলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে। কৃষি সেচে ডিজেলের দাম না বাড়িয়ে ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহের জন্য বিবৃতিতে দাবি জানানো হয়।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
- মে ২০২৬
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
- Website : www.spb.org.bd

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল কর

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা, ফিলিস্তিনে গণহত্যা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-যুদ্ধ বন্ধ কর

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোট

ঢাকায় সিপিবি অফিসের মৈত্রী মিলনায়তনে ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৩টি বামপন্থি, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্মপ্রকাশ ও কর্মসূচি ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জোটের লিখিত বক্তব্য পাঠ ও আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক কমরেড হারুনুর রশীদ ভূঁইয়া, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমরেড নাসিরউদ্দীন নাসু, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক কমরেড রজত হুদা, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শহীদুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

আমরা ১৩টি বামপন্থি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে জাতীয় ও বিশ্ব রাজনীতির এক সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীর সামনে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা এবং আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান করেছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি '২৬ অন্তর্বর্তী সরকার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড' (এআরটি) স্বাক্ষর করেছে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বাণিজ্য উপদেষ্টা অথবা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রমান। তিনি এখন বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এই বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে একতরফা সুবিধা ও একক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার অজুহাতে এই চুক্তিতে তাদের চাহিদা মতো আমাদের দেশের ওপর শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত নানান অসম শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ সারা বিশ্বে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে, সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় পাগল হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সকল আইনকানুনকে পদদলিত করছে। সম্প্রতি ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি বর্বর হামলা চালাচ্ছে। তেলের জন্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস-কে ধরে নিয়ে গেছে। মার্কিন মদদে জায়নবাদী ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতা আজ হুমকির মুখে। বিশ্বের

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের জন্য নীতিমালা, নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের দাবি

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ-এর সমাবেশ মিছিল

ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক, রিকশাসহ ইলেকট্রিক যানবাহনের নীতিমালা চূড়ান্তকরণ, নিবন্ধন, লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদান অন্তর্ভুক্ত করাসহ ৯ দফা দাবিতে রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল '২৬ ঢাকা-বরিশাল, সিলেট-চট্টগ্রাম, দিনাজপুর-গাইবান্ধা, খুলনা-সিরাজগঞ্জ, ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ-মিছিল পরবর্তি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়,

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিগত ১৭ বছর ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬০ লাখ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের BRTA কর্তৃক নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স-প্রশিক্ষণ, রুট পারমিট, সড়ক মহাসড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে স্বল্পগতির (লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন) সার্ভিস রোড নির্মানসহ ৯ দফা দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ঢাকাসহ সারাদেশে গত ১৭ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামেও রিকশাচালকরা অংশগ্রহণ করেছিল। যার ফলে, '২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানে প্রায় ২৪-৪৬ জন রিকশাশ্রমিকসহ হাজার মানুষের আত্মাহুতির মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের পতন হয়েছে।

রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি আইনগত লড়াই পরিচালিত হয়েছিল। ফলে ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মহাসড়ক ব্যাতিত সকল সড়কে ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের রায় প্রদান করেছে। কিন্তু এখনও কোন নীতিমালা চূড়ান্ত ও কার্যকর হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার সময়ক্ষেপণ করেছে কিন্তু কোন কাজ করেনি। নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা গণমাধ্যমের সূত্রে জানতে পেরেছি অগ্রাধিকার কর্মসূচিতে যানজট নিরসন ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি যে, ব্যাটারিচালিত যানবাহন বা ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশাকে একটা নীতি ও শৃঙ্খলায় আনার বিষয়ে কাজ করছে। যা আশার সঞ্চার পথ দেখাচ্ছে। একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে আমরা সেক্টরের ৬০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নীতিমালা চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়ার পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

পায়ে-চালিত রিকশা চালানো একটা প্রচণ্ড অমানবিক ও কঠোর পরিশ্রমের কাজ। প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল বৃষ্টি কিংবা তীব্র শীতেও নিজের জীবিকা ও যাত্রীর সুবিধার কথা ভেবে দিনে-রাতে রিকশাচালকরা রাস্তায় রিকশা চালিয়ে থাকে। চালকদের পরিশ্রম লাঘব, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য আর খরচ কমানোর কথা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে রিকশায় ব্যাটারি স্থাপন করা

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com